রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

(রস-রচনা)

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম্, এ বি, এল্

প্রণীত।

কলিকাতা।

সেন, রায় এণ্ড কোং,

কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্,

[মূল্য ১৷০ ।

প্রকাশক

শ্রীমোহিতকুমার সেন, বি, এ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস,

৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যিনি

বাঙ্গালা ভাষার উষর ক্ষেত্রে

সর্ব্বপ্রথম

নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় হাসির জাহ্নবী-জল-ধারা আনয়ন

করিয়া, তাহাকে আনন্দের শস্য-সম্পদে

বিভূষিত করেন ;

যাঁহার

শিশুর ন্যায় সরল চিত্ত হইতে

কৌতুক-রঙ্গের প্রস্রবণ

বিদ্রূপ-জ্বালা-হীন স্নিগ্ধ কিরণে

মণ্ডিত হইয়া

দিকে দিকে উৎসারিত হইয়াছিল ;

সেই

লোকান্তরিত মহাত্মা—

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

অমর প্রতিভা, অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ও

অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেমের

পবিত্র স্মৃতিতে

এই গ্রন্থখানি

ভক্তি কুসুমাঞ্জলিরূপে

অর্পিত হইল।

সূচীপত্র।

—০:৹:০—

নিবেদন।

এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তিকা-তরণীখানি যে সমালোচনা-বাত্যা ও অবজ্ঞা-তরঙ্গ ভেদ করিয়া খ্যাতির বন্দরে লাগিবে, সে আশা অতি অল্প। তবে নিজের ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াই বা লাভ কি? লব্ধ-প্রতিষ্ঠার পসরা যাইতেছে না, ডুবিয়া গেলেও লোকসান্ নাই।

তারিখ, ২১শে আশ্বিন,
১৩২২ সাল।
ভবানীপুর।

গ্রন্থকার।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ।

আমার কর্ম্মভূমি।
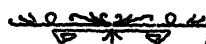
(লালিকা)

ধন মান্ত যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস্ আছে, সব আপিসের সেরা
ও রে, ইটপাথরে তৈরী সেটি, রেলিং দিয়ে ঘেরা।

কোরাস্ { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্ম্মভূমি।

কেরাণী দপ্তরী তারা; কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে এমন মলিন মুখে?
ও তার বেলের ডাকে আঁৎকে উঠি গভীর মনের দুখে।

কোরাস্ { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্ম্মভূমি।

এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন ভর্ৎসনাহার,
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কট্‌মটিয়ে থাকে ?
এমন, কানের উপর হাত খেলে যার মৃদু মধুর পাকে।
কোরাস্ { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্ম্মভূমি।

ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিশে দেহ কাবু,
এপ্রেন্টিস্ পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে ;
তারা, টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টেবিল মাথায় দিয়ে।
কোরাস্ { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্ম্মভূমি।

কেরাণীদের শীর্ণদেহ কোথায় এমন পাবে কেহ ?
চাকরি মা, তোর চরণ দুটি নিত্য পূজা করি ;
আমার, এই আপিসের কর্ম্ম যেন বজায় রেখে মরি।
কোরাস্ { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল-বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্ম্মভূমি।

হাসি।

এদেশে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার অনুযায়ী দর্শন নাই। এমন কি সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে আমরা পারদ-দর্শনেরও পরিচয় পাই—অথচ উক্ত জড়-পদার্থের সহিত, কি ঔজ্জ্বল্যে, কি চাঞ্চল্যে, যে ভাবপদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ—সেই হাসির দর্শন আমরা ভারতবর্ষে পাই না।

ভারতমাতার মুখে আজ হাসি নাই—পূর্ব্বে ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

আমাদের এ দেশ দার্শনিক দেশ, এবং চিরকালই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে হাস্যরস অপেয়, অদেয় এবং অগ্রাহ্য। যে দেশের মাথার উপর বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-আদি ড্যামোক্লিসের তরবারির ন্যায় অষ্টপ্রহর ঝুলিতেছি—যে দেশের দর্শনপুরাণে বলে ঐহিক সুখের কোনরূপ মূল্য নাই, কারণ সুখ দুঃখানুবিদ্ধ, এবং দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ; যে দেশের সামান্য কৃষকেরাও মায়া-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যান করে—সে দেশে হাসি ফুটিয়া উঠিবার অবসর কোথায়? হাসির মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিলে এদেশের লোকে গাম্ভীর্য্যের শিলমোহর-মারা মুখকে জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিত না, ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রবীণতার পক্ককেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিত না, এবং নিরপরাধী বালকবালিকাদিগকে "যত হাসি তত কান্নার" কাল্পনিক বিভীষিকা দেখাইত না। যৌবনসুলভ ক্রীড়াকৌতুককে

চপলতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করা এদেশে বুদ্ধিমান্ লোকে একটি নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন। ইঁহারা যখন অতি গম্ভীরভাবে বলেন যে, "শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ না"—তখন ইচ্ছা হয় এই উত্তর দিই যে, তোমার বিজ্ঞতার শিং লইয়া তুমি বসিয়া থাক—পরের উদরে সেটি প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টাটা না করিলেই ভাল হয়, কেননা তাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি কারণে অনেকে হাসির চর্চ্চা করিতে অনিচ্ছুক। ইঁহাদের বিশ্বাস হাসি পদার্থটি বিদেশী—অতএব এই স্বদেশীয়তার দিনে তাহা বয়কট করাতে জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া হয়।

হাসি জিনিষটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় না হইলেও এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, অদ্যাবধি পাশ্চাত্য দেশবাসীরাই একাগ্র মনে তাহার চর্চ্চা করিয়াছে। আরিষ্টফেনিসের বক্ষে উৎসারিত হাস্যের নির্ঝর উত্তরোত্তর স্ফীত হইয়া বর্ত্তমানে ইউরোপে উত্তালতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা হাস্যরসে প্রাণবান্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিন ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হাসির অন্তর্ধান হইবে—সেদিন ইউরোপীয় সভ্যতাও হিন্দু সভ্যতার ন্যায় ঝুনো হইয়া যাইবে।

ইউরোপে হাসি আছে বলিয়া হাস্যের দর্শনবিজ্ঞানও আছে। দর্শন, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নির্ণয় করিতে চাহে, তাই দার্শনিক সমাজে নানা মুনির নানা মত—কেননা এ বিশ্বের আদি ও অন্তের সঠিক খবর কেহই জানেন না। অপর পক্ষে বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি ও নিয়মের (Law) কারণ

নির্ণয় করিতে চাহে—তাই এ ক্ষেত্রে সকলেই একমত। এই কারণে হাস্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এ বিষয়ে দার্শনিক মতের বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক মতে হাস্য জীবজগতে ক্রমবিকাশিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনুষ্যেতর প্রাণী ছিলেন। তাঁহারা কোনও আহার্য্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইবামাত্র, ভোজন করিবার পূর্ব্বেই ভোজনক্রিয়ার অভিনয় করিতেন যথা, মুখব্যাদান দন্তবিকাশ ইত্যাদি। তাঁহাদের বংশধরেরা কালক্রমে যখন ইভলিউ-সানের উন্নত স্তরে আরোহণ করিল—তখন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভোজনানন্দের ভঙ্গীগুলি অন্যান্যরূপ আনন্দের সহিত জড়িত হইয়া গেল। মূল কারণ হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সকল পশুভাবগুলি মানব-সংস্কারে পরিণত হইল। অর্থাৎ যে চাঞ্চল্যের উৎপত্তি উদরে, তাহা হৃদয়ে স্থিতি লাভ করিয়া হাস্যরূপে বিকসিত হইয়া উঠিল। এককথায় বীভৎসরস হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ এই কারণে অদ্যাবধি অনেকে রসিকতা করিতে হইলে বীভৎস-রসের অবতারণা করেন।

পূর্ব্বোক্ত মত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। সুতরাং ইহা চূড়ান্ত মত নহে। বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। এই কারণে জড়বিজ্ঞান ক্রমে পরমাণু-বিজ্ঞানে পরিণত হয়, এবং জীবতত্ত্ব জীবাণুতত্ত্বে উপস্থিত হয়—Biology Bacteriolgoyতে পরিণত হয়। যতক্ষণ প্রটো-

প্রাজমের মুখে হাসি না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ হাস্যবিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যে হাস্যের যে সূক্ষ্মশরীর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি ও পরিচয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

হাসির বীজাণু শুভ্রবর্ণ এবং প্রেম ও ক্রোধের বীজাণু অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র এবং অতিশয় দ্রুতগামী। ইহাদের জন্মভূমি হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে ফুস্‌ফুসে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইহারা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয় এবং আলোকের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে গমন করে। এই বীজাণু অতিশয় সংক্রামক। কিন্তু দধির বীজাণুর ন্যায় ইহারা স্বাস্থ্যকর, এবং যাহার ধমনীতে ইহারা অবস্থিতি করে তাহার আর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হয় না। হাস্যের বীজাণু মরিয়া ভূত হইলে তাহা বিষাদের বীজাণুতে পরিণত হয়। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আমার সাধ্যের অতীত। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি যে হাস্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তাদের আর যে জ্ঞানই থাকুক না কেন, হাস্যরসের জ্ঞান নাই, নচেৎ তাঁহারা একটি প্রত্যক্ষ কার্য্যের উপর এত অপ্রত্যক্ষ কারণের ভার চাপাইতেন না।

আসল কথা, হাস্য কোনরূপ দর্শন কিংবা বিজ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়ে না। কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করাই উক্ত উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হাসি কিন্তু স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল। সকল প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই হাসি জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বাধীনতাই

তাহার লক্ষণ ও ধর্ম্ম। হাসির যদি কোনরূপ বাহ্য কারণ থাকে, তাহা হইলে কোন বস্তুর আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ই সেই কারণ। উদাহরণস্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, যদি কোনও স্থূলকায় ব্যক্তি পিচ্ছিলপথে অগ্রসর হইতে গিয়া সহসা পদদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া সশব্দে ভূপতিত হন, তাহা হইলে অদার্শনিক দর্শকের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, স্থূলদেহের ঐরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে, তাহার যে একটা পরিচিত গাম্ভীর্য্য আছে তাহা একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হাস্যরসের যে কোন উদাহরণ দাও না, তাহা এই একই মূলসূত্র অনুসরণ করে। অপর পক্ষে পৃথিবীতে যাহা কিছু নিজের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হাসি একমুহূর্ত্তেই তাহাকে ভূতলশায়ী করিতে পারে। চার্ব্বাকের হাসি, যুগসঞ্চিত বিধিনিষেধের স্তূপ অবলীলাক্রমে ধূলিসাৎ করিয়াছিল। এই কারণেই হাস্যের সহিত দর্শনের চিরদিনই দা-কুমড়ার সম্বন্ধ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ কারণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা বৃথা। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—হাস্য করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।

সনাতন মত যাহাই হউক, মানুষের পক্ষে হাসা যে কর্ত্তব্য তাহার প্রথম কারণ এই যে, জীবজগতে একমাত্র মানুষই এই ক্রিয়ার অধিকারী। পশুপক্ষী ক্রন্দন করিতে পারে, কিন্তু হাসিতে পারে না। সুতরাং হাস্যচর্চ্চা করার অর্থ—মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করা। এস্থলে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক

তাহার বিপরীত কার্য্য করা,—সংক্ষেপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি দমন করাই মানবের পক্ষে শ্রেয়ঃ অতএব কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মানুষ যখন কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মিয়াছে তখন তাহার হাসিতে হাসিতে মরাই কর্ত্তব্য।

আর একটি কারণেও মানুষেরও হাস্য করা কর্ত্তব্য। জগতে যাহাকিছু সুন্দর তাহাই হাসে। আকাশে চন্দ্র তারকা হাসিতেছে, সমুদ্রবক্ষে ফেনপুঞ্জ হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে ফুলের দেহ গাছের উপর হেলিয়া পড়িতেছে, নদীর গালে টোল খাইতেছে। কালিদাস বলিয়াছেন যে, হিমালয়-শিখরশায়ী তুষাররাশি ত্র্যম্বকের অট্টহাস্য। আধুনিক কবিদিগের মতে কেবল তুষার নয়, সমগ্র সৌরজগৎ সৃষ্টিকর্ত্তার হাসি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবিতে কবিতে যাহা-কিছু মতভেদ তাহা এই লইয়া যে, সে হাসি বিদ্রূপের কি আনন্দের। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, হাসিতেছে বলিয়াই জ্যোৎস্না, ফুল ইত্যাদি সুন্দর? হাসির সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ হাসিলে যে তাহাকে সুন্দর দেখায় শুধু তাহাই নহে, তাহার মনের ময়লাও কাটিয়া যায়। সাহিত্য-দর্পণকার বহুপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হাসি পদার্থটি শুভ্র, সুতরাং তাহার অন্ধকার বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং নির্ভয়ে অপরকে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে, "যে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চায় সে থাকুক্, কিন্তু তুমি নিজের আলোতে নিজে খেলা কর।" চির-অন্ধকার ত একদিন সকলকেই গ্রাস করিবে—তাই বলিয়া ইতিমধ্যে তুব্ড়ির ফুল কেন কাটিবে না?

অতএব যখন স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্ত করা কর্ত্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং যেহেতু শাস্ত্র ব্যতীত জনসমাজকে শিক্ষা দিবার অপর কোনও উপায় নাই, সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্ত-শাস্ত্র রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ দর্শন বিজ্ঞান রচিত হইতে পারে না—কারণ হাস্ত করা একটা আর্ট। এই আর্ট কিরূপে চর্চ্চাদ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদেরা, অর্থাৎ যাঁহারা শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোনও বিশেষ ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে সেই ভাবও মনের ভিতর জন্মগ্রহণ করে। যদি কেহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তারস্বরে কাহারও উপর কটুকথা বর্ষণ করেন—তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইবে; অপর পক্ষে যদি চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া গদ্‌গদ-স্বরে কাহারও নিকট প্রিয়কথা বলা যায়, তাহা হইলে মনে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধ্য। সুতরাং হাস্যোচিত মুখভঙ্গীগুলি কস্ত করিতে পারিলে তোমার মনে হাস্যরসের উৎস খুলিয়া যাইবে। অবশ্য একদিনে এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। দিনের পর দিন এই ভঙ্গীগুলি অভ্যাস করিতে হইবে, দস্তুরমত কসরৎ করিতে হইবে। থিয়েটারে কমিক-পার্টের অভিনেতাগণ যেরূপ রিহার্শলের

পর রিহার্শল দিয়া মুখের হাসিটি বেমালুম স্বাভাবিক করিয়া তোলেন —তোমাদিগকেও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সংসার রঙ্গভূমিতে আমরা সকলেই "কমিক্ একটার"—এই সত্যটি স্মরণ রাখিলে তোমাদের পক্ষে হাস্যের বাহ্য লক্ষণগুলি শিক্ষা করা তত কঠিন হইবে না। হাসির আর্ট একবার শিক্ষা করিতে পারিলে, সমাজে তাহা অনায়াসে প্রচার করিতে পারিবে। তুমি ভালবাসিলে যে অপরকে ভালবাসাইতে পারিবে, এমন কোনও কথা নাই—কিন্তু তুমি হাসিতে পারিলে অপরকে হাসাইতে পারিবে; কেননা হাসি সংক্রামক—প্রেম নয়।

শিক্ষার্থীদিগের সাহায্যার্থে হাসির বাহ্য লক্ষণগুলি নির্ণয় করা আবশ্যক। হাসি নানাজাতীয়, এবং বিভিন্ন-জাতীয় হাস্যের আবির্ভাবের স্থানও স্বতন্ত্র। সুতরাং আমি উপসংহারে সংক্ষেপে হাসির জাতিভেদের পরিচয় নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দিতেছি।
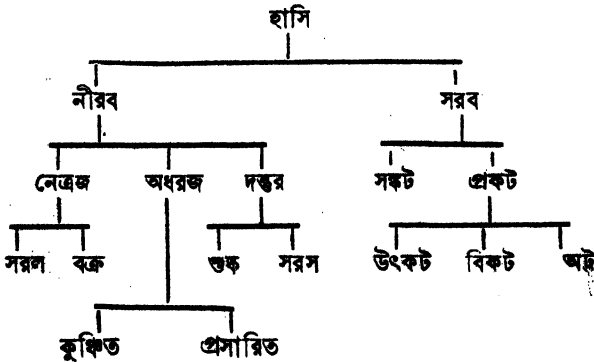
অর্থাৎ হাসি প্রধানতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত—দৃশ্য ও শ্রাব্য। ইহার প্রথমটি স্ত্রীজাতির অধিকারভুক্ত—দ্বিতীয়টি পুরুষের। ধর্ম্মের ন্যায় হাসিও অধিকার-অনুসারেই চর্চ্চা করা উচিত। তবে দৃশ্যহাস্যের দন্তুর শাখায় পুরুষেরও অধিকার আছে—এবং কোন-কোনও অবস্থায় স্ত্রীজাতিকেও বাধ্য হইয়া গুরুজনের সম্মুখে শ্রাব্যহাস্যের অন্তর্ভূত সঙ্কট হাসিরও অনধিকার চর্চ্চা করিতে হয়। যে হাসি শত চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ চাপা যায় না, এবং ইচ্ছা ও চেষ্টার বিরুদ্ধে ফিক্‌ফিক্ ধ্বনিসহকারে গৃহশত্রুর ন্যায় বহির্গত হইয়া পড়ে,—সেই হাসির নাম সঙ্কট—কারণ উভয়সঙ্কট স্থলেই এই অবাধ্য হাসি জন্মলাভ করে। এক সরলজাতীয় ব্যতীত উপরোক্ত সকল প্রকার হাসিই যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা শিক্ষা করা যায়।

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ সরল নেত্রজ হাসি—চোখের উপরই ভাসিতে থাকে। এ অনির্ব্বচনীয় হাসির সাক্ষাৎকার লাভ করাই মহা সৌভাগ্যের কথা। এ হাসি অনুকরণ করিবার নয়—অনুসরণ করিবার বস্তু।

পূর্ব্বোল্লিখিত সকল প্রকার হাসি সাহিত্যে পূর্ণ বিকসিত হইয়া উঠে। সুতরাং জীবনে যদি হাসির চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কেননা ভারত-উদ্ধারের অপর কোনও উপায় নাই। চোখের জলে চোখ ফোটে না।

সোণার ঘড়ি।

—:※:—

(লালিকা)

গগনে উদিল উষা হ'ল ফরসা,
ঘরে একা বসে আছি, নাহি ভরসা ;
রাশি রাশি ভারা ভারা বই পড়া হ'ল সারা,
ব্রীফ্ নাই পড়ি ধারা আঁখি সরসা ;
পড়িতে পড়িতে বই হ'ল ফরসা।

একখানি ছোট মেস্ আমি একেলা,
চারিদিকে বকা ছেলে করে জটলা ;
স্থালে ঝোলে দেশী-আঁকা, কালী তারা কালি মাখা,
আমদানি নাহি টাকা প্রভাত-বেলা,
চেয়ারেতে বসে তাই ভাবি একেলা।

পান খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে কে আসে দ্বারে ?
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে,
ভারি চালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়,
আশাগুলি নিরুপায় করে হাহা-রে,
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও বাড়ী কি দেশে
বারেক দাঁড়াও মোর নিকটে এসে ;
যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসি কেস্ দাও,
আগে ত তামাকু খাও ক্ষণেক ব'সে ;
উপদেশ কিছু মোর লইও শেষে।

খাও খাও, রাখ কেন মেঝের পরে ?
আছে কিছু ? নাই বুঝি,—দিতেছি ভরে ;
এতকাল পুঁথি খুলে, যা কিছু খেয়েছি গুলে
খাটাব তা বিনা মূলে তোমারি তরে,
আমারে উকীল দাও করুণা ক'রে।

কেস্ নাই কেস্ নাই ছোট চাকরি,
মাম্‌লা বলুন্ দেখি কেমন করি ?
এতবলি ধীরে ধীরে গেল সে চলি বাহিরে,
শূন্য চেয়ারে আমি রহিনু পড়ি ;
চেয়ে দেখি নিয়ে গেছে সোনার ঘড়ী।

গরুর গাড়ি।

পাঠক! আপনি কখনো গো-শকট বা গরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন তবে বলিতে বাধ্য হইব যে, আপনার গ্রাম্য জীবন এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। একাগাড়ির সহোদর এই দিব্য বিমানে যিনি না চড়িয়াছেন তিনি যানাধিষ্ঠান-জনিত বিমল-আনন্দের সারটুকুই অনুভব করিতে পারেন নাই। যেমন জীবজন্তুর মধ্যে দ্বিপদ মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শকট-জগতে এই দ্বিচক্র গোযানই শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়। আপনি অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারি না।

ঐ যে অদূরে পল্লীপ্রান্ত দিয়া মৃদু-মন্থর গতিতে কি-যেন-কি একটা যাইতেছে, পাঠক দেখিয়াছেন কি, উহারই নাম গরুর গাড়ি। আহা মরি, গমনের কি গাম্ভীর্য্য! উহা কি প্রশান্ত ও উদারতাব্যঞ্জক নহে? ইদানীন্তন নব্য শকটাদির ন্যায় উহার বাল্যসুলভ চপলতা নাই, অসমসাহসিক বেগ নাই, কিন্তু আছে—যাহা কেবল মর্য্যাদা ও উচ্চপদের পরিচায়ক—"ধীর ললিত গতি"। আর ঐ ধ্বনি—ঐ

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোয়ারা' নামক পুস্তকে "গরুর গাড়ী" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। সে প্রবন্ধের সহিত এ প্রবন্ধের অনেকস্থলেই ভাবের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু 'কোয়ারা' প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বেই এ প্রবন্ধটি লিখিত ও ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত হয়। ইহা সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল — সালের   মাসে।

চক্রমধ্য-বিনিস্সৃত মর্ম্মভেদী সুদীর্ঘ আর্ত্তনাদ, ঐ আ,—ই,—ঈ,—উ—সমন্বিত অজস্র ক্রন্দন-বিলাপ, উহাতে কি হৃদয়ের পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করে না, উহাতে কি একটা অনির্ব্বচনীয় ও অভূতপূর্ব্ব বেদনায় শ্রোতার চিত্তকে কাতর করিয়া তুলে না? না জানি ঐ করুণ সুরে ও কি বলিতেছে, কোন্ অত্যাচারের কথা জগতের সম্মুখে জানাইয়া দিতেছে। বোধ হইতেছে, আমি যেন উহার অর্থ কতকটা বুঝিতে পারিতেছি, ও যেন বলিতেছে, "দেখ মানুষের কি অন্যায়, কি অসঙ্গত ব্যবহার। আজকাল তাহারা নূতন নূতন শকট পাইয়া আমাকে ভুলিতে বসিয়াছে। আমার আর সে আদর নাই, সে সম্মান নাই। অপরাধ কি? অপরাধ আমি পুরাতন। অন্য দেশে পুরাতনের কত যত্ন কিন্তু এ হতভাগ্য দেশের সবই বিপরীত। অপরাধ আমার রূপলাবণ্য নাই;—অন্য কেহ বলে বলুক দেশের লোকে একথা বলিলে বড় লাগে। আর আমি যে প্রকৃতই সৌন্দর্য্যহীন একথা দু-একটা আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত বিকৃত-মস্তিষ্কের কথায় বিশ্বাস করিব না। আর আমার নির্ম্মাণে নাকি কোন কৌশল নাই, বৈচিত্র নাই, শিল্প-চাতুর্য্য নাই। সর্ব্বত্রসুলভ সরল বংশদণ্ড-খণ্ডিত বাঁখারিই আমার দেহের অস্থিপঞ্জর। কাজেই আমার দেহে মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আসিবে কোথা হইতে? আমি একটা ত্রিভঙ্গ ও কদাকার জিনিষ মাত্র। একথায় আমি এইমাত্র উত্তর দিই যে, সরল হইলে সরলের অর্থ বুঝিতে। তোমাদের হৃদয় স্বভাবতই কুটিল ও বক্র। তোমরা আমার স্বাভাবিক শ্রী উপলব্ধি করিবে কিরূপে? কেহ কেহ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বলেন যে,

আমারা পশু-সংযোজন প্রণালী অতিশয় আদিম ও মানব জাতির প্রথম সভ্যতার সৃষ্টি। একথায় এই বলা হইল যে, এরূপ উপায় পুরাতন অশিক্ষা ও বর্ব্বরতার একটা অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। ভাল, কিন্তু উহাতে দোষ কি? দুই পার্শ্বে কাষ্ঠ-কীলকযুক্ত একটা বাঁশের যোয়াল আছে, তাহাই গোযুগলকে টানিতে হয়। দোষের মধ্যে ত এই দেখিতে পাই যে, নিরীহ পশুদিগকে একেবারে "লগেজ" করিয়া বাঁধা হয় নাই, নিহাৎ টানিতে কষ্ট হইলে দু'-একবার ঘাড়টাকে ছিনাইয়া লইতে পারে। হয় ত কেহ বলিবেন, ঘাড়ের উপর খানিকটা ভার চাপাইয়া দিবার অর্থ কি? টানিলেই যখন হয় তখন বহন করাইবার আবশ্যকতা কি? কথাটা শুনিতে যত সোজা তলাইয়া দেখিলে ততটা বোধ হয় না। দাঁড়াইয়া থাকিলে অবশ্য বহনে একটু কষ্ট আছে কিন্তু চলিবার সময় উভয়ই সমান। ভারটা হয় স্কন্ধে চাপিবে না হয় বুকে কসিয়া ধরিবে। তবে আর বেশী লাভ কিসে? বরঞ্চ আমার পক্ষে একটু সুবিধা আছে। সেটুকু এই যে ক্ষুধার্ত্ত পরিশ্রম-কাতর প্রাণী সময়-অসময়ে সাহস করিয়া ভূমি হইতে ঘাসের গোছা বা খড়ের আঁটি তুলিয়া চর্ব্বণ করিতে পারে। এইরূপে যোয়াল, মুখ ও নবীন তৃণের মধ্যে প্রেমের সম্মিলন ব্যাপারে সহায়তা করিয়া বরং বন্ধুরই কার্য্য করে। যাই হোক্ নিন্দুকদিগের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডনের প্রয়োজন দেখি না। আমি নিজের মনেই নিজের দুঃখ গাহিয়া যাইব, যদি কেহ উদারচেতা থাকেন বুঝিবেন, সহৃদয় থাকেন অনুভব করিবেন কিন্তু আমি চিরকালই কাঁদিব আর বলিব, "মানব! তোমরা

বড় নিষ্ঠুর। তোমরা আজ আমার নিন্দা কর, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি নাগরা জুতা ও খড়ম সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমি না থাকিতাম, তবে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা কি হইত। বোধ হয় হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহাদের পায়ের তলা মাথার সহিত "প্লেন্" হইয়া যাইত। মাঠ হইতে শস্য কাটিয়া হয়ত অনেক সময় নিজেদেরই স্কন্ধে করিয়া আনিতে হইত, দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। আমরা পৌরাণিক রথেরই বংশধর, তাহারই "ইভোলিউসান্" বা ক্রম-বিকাশ। আমাদের জন্মের সময় নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। যথার্থ ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখ দেখি আজকালকার কোন্ শকটটাকে আমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কাহারও জল চাই, কয়লা চাই, কাহারও তার চাই, ডাণ্ডা চাই, কাহারও উপর চড়িয়াও পা চালান চাই। আমার সে সব কোনই হাঙ্গামা নাই, আমার চাই কেবল মাত্র দুইটী গরু; তাও আজকাল সংখ্যায় ক্রমশই বেশী হইতেছে। ঘোড়ার গাড়িরও লাগাম চাই, চাবুক চাই, দানা চাই আমার কিন্তু চালকের তর্জ্জন গর্জ্জনই নেটিভ্ গরুদিগের উদর পূর্ণ করে এবং লাঙ্গুল-মর্দ্দনই তাহাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করাইয়া দেয়। উপরোক্ত শকটদিগের মধ্যে কেহ বলিবেন আমার লাইন চাই নতুবা চলিতে পারি না, কেহ বলিবেন আমার পাকা রাস্তায় যাওয়া অভ্যাস, নতুবা পা ক্ষইয়া গেলে "ড্যামেজ্" দিবে কে? ইহারা যেন সব আইনব্যবসায়ী কেবল কূটতর্ক করিতেই মজবুদ। আমার কিন্তু কোন ওজর নাই, আপত্তি নাই, পথ নাই, অপথ নাই, জল নাই,

মাঠ নাই, শুকনো নাই, কাদা নাই, আমি চালকের ইঙ্গিতানুসারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত তোমাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাঁটু সমান জলকাদা ভাঙ্গিয়া যাইতেও প্রস্তুত। কই, তবুত তোমরা একবার ভুলিয়াও আমার প্রশংসা কর না! আমার পরিশ্রমের হিসাবেও একটু সুখ্যাতি কর না! সকলই আমার অদৃষ্ট। তাই সময় সময় অদৃষ্টকে নিন্দা করি, আর তোমরা সেই অদৃষ্টের পক্ষপাতী, তাই তোমাদিগকে বলি যে তোমরা অতি নিষ্ঠুর, ভ্রান্ত ও ন্যায়-পরতাহীন।"

পাঠক! গরুর গাড়ির আত্মবৃত্তান্ত শুনিলেন ত? বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখুন, গরুর গাড়ির আপত্তি করিবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা গরুর গাড়ি চড়িতে এত নারাজ কেন? আপনি হয়ত বলিবেন যে উহা বড় ঢিমে-তেতালা ধরণে চলে, একটু জলদ-ঠুংরী গোছ চলিলে সময়েরও সদ্ব্যয় হইত, কম বিরক্তিজনকও হইত। কিন্তু যখন কেবল আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত pleasure-trip এ বাহির হন, তখন ত একবার গরুর গাড়ির অঙ্গে পদধূলি প্রদান করিতে পারেন। আর বিরক্তির সম্বন্ধে যাহাই বলুন, এটা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পাঁচ মিনিটে পাঁচ মাইল যাওয়া অপেক্ষা আধ ঘণ্টায় এক মাইল যাইতে আমরা অনেক সময় অধিক আনন্দ বোধ করি। "ছয় দণ্ডে চলে যায় ছদিনের পথ" শুনিতে বেশ চমৎকার, কিন্তু ঐরূপ দ্রুতগামী শকটে চড়িলে সময়ের সহিত দূরত্বের সামঞ্জস্য বিষয়ে যেন কেমন একটা গোলমাল হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সময় ও দূরত্ব যে একই

জিনিষ এই মিলের মতটাকেও কে যেন গোড়া ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া যায়।

মানুষ স্বভাবতই আত্মাভিমানী। অতি অল্প কারণেই তাহারা স্ফীত হইয়া আপনাদিগকে জগদীশ্বর মনে করে। যতদিন তাহাদিগের মন হইতে এই বৃহত্ত্বের জ্ঞান দূরীভূত না হয়, যতদিন তাহারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আপনাদিগকে কীটাণুকীট হইতেও ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে না শিখে ততদিন তাহাদের হৃদয় তমোগুণ-বর্জ্জিত হয় না, এবং ধর্ম্মজীবনের উন্নতিপথও অপ্রশস্ত থাকে। যে মুহূর্ত্তে এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মানব দেবতা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেইভাব সহসা মানবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না। কিন্তু এই পরম হিতৈষী শকট তাহাই করিয়া দেয়। যথার্থ ধর্ম্মযাজকের ন্যায় উহা প্রতি চক্রাবর্ত্তনেই আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে, পৃথিবী কি বৃহৎ। এক মাইল যাইলেই আপনার মনে হইবে, আপনি বুঝি দশ মাইল অতিক্রম করিলেন। বাল্যকাল হইতে ভূগোল অধ্যয়ন করিয়াও পৃথিবীর বিস্তার সম্বন্ধে যে ধারণা করিতে পারেন নাই, আজ এক ঘণ্টায় তদপেক্ষা অধিক করিতে পারিবেন। এমন কি আপনার ইহাও বিবেচনা হইতে পারে যে, গ্রন্থকারগণ পৃথিবীর পরিধি হিসাব করিতে গিয়া মাইলের সংখ্যা কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং পৃথিবী যে কমলালেবুর মত এ দৃষ্টান্তটা একেবারেই হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইবে।

কোন কৌতুকপ্রিয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন, যদিও মানুষের

সাধারণতঃ দশ অবস্থা তথাপি গরুর গাড়িতে কেবল তিনটি অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়, যথা, চিৎ, কাৎ ও উপুড়। কথাটা বড়ই সত্য, যাই করুন তাই করুন মোটের উপর শুইতেই হইবে। শকটের নির্ম্মাণেই এই কৌশল যে দাঁড়ান ত দূরের কথা বসিতেও পারিবেন না। যদি চেষ্টা করেন তবে অগত্যা সে প্রয়াস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ উপরিভাগে দোদুল্যমান ছই বা ছাদের সহিত আপনার মস্তকের ঘাত-প্রতিঘাতাদি স্বাভাবিক ঘটনা অনিবার্য্য। এইখানেই হয়ত আপনি স্বাধীনতাসঙ্কোচ ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবেন, কিন্তু ইহা মনে রাখিবেন যে, উদ্দাম স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থার পরিচায়ক নহে। যেমন সর্ব্বোচ্চ নৈতিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসমূহকে আত্মোন্নতি, সমাজোৎকর্ষ প্রভৃতি কোন একটা আদর্শানুসারে সংযত করিতে হয়, যেমন সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য শাসনপ্রণালীতে জাতিগত সমৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সীমা নির্দ্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও উপকারী, সেইরূপ সকল অবস্থা অপেক্ষা উৎকর্ষতা নিবন্ধন গরুর গাড়িতে কেবল শয়নেরই ব্যবস্থা। এরূপ স্বাধীনতাসঙ্কোচ কিছুতেই অপ্রিয়কর হওয়া উচিত নয়। এখানে হয়ত আপনি স্বীকৃত বিষয় লইয়াই গোল করিবেন। হয়ত আপনি শয়নাবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়েই সন্দিহান। এরূপ হইলে আমি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিব যে, আপনি বাঙ্গালী কি না। যথার্থ খাঁটী বাঙ্গালী হইলে উহা প্রতিপাদন করিবার কোনই আবশ্যকতা হইত না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দাঁড়ান, বসা ও শোওয়া, এই তিন অবস্থার মধ্যে-ক্রমিক স্থান নির্দ্দেশ

করিতে হইলে সুখই তাহাদের পরিমাণ। এক্ষণ, শয়নাবস্থাতেই সুখ যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এ কথা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই এত শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইংরাজের জীবন কোলাহলময় কার্য্যক্ষেত্রেই অতিবাহিত হয়। ছুটাছুটী, দৌড়াদৌড়ি করিবার নিমিত্তই পরমেশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত সমস্ত এবং কর্ম্মের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। তাহার পোষাক পরিচ্ছদই তাহাকে অনেকটা খাড়া করিয়া রাখে, আমাদের মত বসিয়া বিশ্রাম করাও ঘটে না। আবার আমাদের যেখানে ঢালা ফরাস পাতা থাকে, লোকে আসিয়া গড়াইতেছে সেখানে তাহাদের চেয়ার ও টেবিল, শয়ন করিবেন কোথায়? কাজে কাজেই ভাবিয়া দেখুন শয়নের মাহাত্ম্য বা মর্ম্ম তাহারা কত-টুকু বুঝিতে পারিবে। বুঝিতে হইলে ও বিষয়ে অনেকটা তন্ময় হওয়া চাই, অনেকটা অনুধাবন করা চাই। পরিশ্রমক্লান্ত শরীরে শয়ন ও নিদ্রাবেশের মধ্যে অতি অল্পই বিলম্ব হয়। কাজে কাজেই ইংরাজের ভাগ্যে, শয়ন করিবার যে একটা গোলাপী ও মোলায়েম আয়েস আছে, তাহা অনুভব করিবার অবসরই হয় না, যেমন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি দ্রুতবেগে জঠর পূর্ণ করিবার সময় রসনার তৃপ্তি অতি অল্পই অনুভব করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মানসিক প্রকৃতিও উহার অনুকূল নহে। সুতরাং শয়ন বিষয়ে তাহাদের মতামত কিছুতেই প্রামাণ্য নহে। পরন্তু একবার পায়চারী করিতে করিতে কোন ধনী জমীদার বা বাবুর বৈঠকখানায় গমন করুন। মন্ত্রিসদৃশ তাকিয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্তদেহভার, দ্বিতীয়-তাকিয়া-তুল্য-

বিলম্বিত-ভুঁড়ি উক্ত মহোদয়ের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র ও সুগন্ধি তাম্রকূট-ধূমপুঞ্জের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করুন; বিনা বাক্যব্যয়ে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, শয়ন অপেক্ষা শান্তি-প্রদতর অবস্থা আর নাই। সাধে কি পৌরাণিকগণ নারায়ণকে অনন্ত-শয্যাশায়ী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনন্তশয্যা, কাজেই তাহার সুখও অনন্ত, তিনি সদানন্দময়। শয়ন জিনিষটা আরও এত মধুর কেন জানেন? কারণ উাহর সহিত নিদ্রা, বিশ্রাম, শান্তি প্রভৃতি যাবতীয় মধুর অবস্থাই একাঙ্গীন ভাবে সংশ্লিষ্ট। এক্ষণ, শয়নাবস্থা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, গরুর গাড়ির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদন করা আর কষ্টকর হইবে না। যদি সুমিষ্ট ফলে সকলেরই অভিরুচি থাকে, তবে যে দেশে সুমিষ্ট ফল ব্যতীত অন্য ফল নাই, সে দেশ কাহার না বাঞ্ছনীয়? সুখকেই খুঁজিয়া লইতে হয়, যেখানে সুখই আপনাকে খুঁজিয়া লইবে, সে স্থান যে অতীব রমণীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গরুর গাড়ি ভিন্ন যদিও অন্য কোন শকটে শয়ন করিতেই হইবে এরূপ কোন বিশেষ সুবিবেচনা নাই, তথাপি দেখা যাক্ তাহাতে উত্তমরূপ শয়নের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কেমন একটা স্বভাব যে গাড়িতে চড়িয়া আগেই একটু শয়নের বন্দোবস্ত দেখি। প্রথমতঃ রেলগাড়ি—রেলগাড়িতে আর কিছু না হউক, হাস্য-পরিহাস, কলহ-কোলাহল ও ধূমপানের বেশ সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু অধিক ব্যয়সাপেক্ষ দু' একখানা গাড়িতে ভিন্ন শয়নের কোন সুবিধা নাই। সুতরাং সাধারণ যাত্রিগণ অর্থাৎ যাঁহারা

অগতির-গতি শ্রেণীতেই আরোহণ করেন তাঁহারা নিরুপায়। বলিতে পারিনা কেহ তাহাতে হাড়গোড়-ভাঙা "দ"র ন্যায় কিঞ্চিৎ-কুণ্ডলীকৃত দেহে, ব্যাগোপাধানে, নয়ন নিমীলিত করিয়া দুই এক ষ্টেসন অতিক্রম করিয়াছেন কিনা, কিন্তু সেটা ঠিক শয়ন নহে, শয়নের অনেকটা ব্যঙ্গোদ্দীপক অনুকৃতি মাত্র। যদি বা কখন আকস্মিক সৌভাগ্য বশতঃ কেহ নিদ্রাদেবীর আরাধনার একটু সুযোগ প্রাপ্ত হন, তবে তাহাও ক্ষণিক বিড়ম্বনা মাত্র। হয়ত তিনি সবে ভক্তিভরে গদ্‌গদ-চিত্তে দেহ-যষ্টিকে কাষ্ঠাসনে লুটাইয়া দিয়াছেন, হয় ত সবে নাসিকা-যন্ত্রে মৃদু ঘর্ঘর ধ্বনিতে স্তব করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, হয়ত নিদ্রাদেবীর কোমল পদভরে ভারাক্রান্ত নয়নযুগল সবে দৃশ্য রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এমন সময় কোন চসমাধারী পুরুষ-পুঙ্গব আসিয়া তাঁহার পূজার বিঘ্ন ঘটাইয়া দিল। আগন্তুকের মধুর সম্ভাষণে প্রীত হইয়া নিদ্রাদেবী ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক কোথায় উড়িলেন; তাঁহারও ধ্যানভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-গোচর হইল, "মহাশয় গাত্রোত্থান করুন, গাড়ি কেবল আপনার জন্য নয়" ইত্যাদি। শুনিয়াই তাঁহার পিত্ত তিক্ত হইয়া গেল; কিন্তু কি করিবেন, দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই, গাড়ির গায়েই বড় বড় শ্বেত অক্ষরে লিখিত আছে "প্রত্যেক বেঞ্চে ৫ জন বসিবে।" অগত্যা উঠিতে হইল এবং বসিয়া বসিয়া যতটা সম্ভব পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-প্রক্রিয়ার কার্য্যারম্ভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তন্দ্রা আসিলেই মস্তকে মস্তকে সংঘর্ষণ হইতে লাগিল, সমস্তই পণ্ড হইল।

দ্বিতীয়তঃ ট্রামগাড়ি; ইহাতে শয়ন ত দূরের কথা বসিয়া

যাওয়াও অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। গাড়ির পশ্চাতে যে অল্পস্থান টুকু আছে তাহাও সময়ে সময়ে দণ্ডায়মান যাত্রীর দ্বারা এরূপভাবে আক্রান্ত হয় যে; দূর হইতে দেখিলে তিন্তিড়ী বৃক্ষে বাদুড়দল ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার উপর ক্রমাগত লোকের আমদানী ও রপ্তানী, যেন জগতের কোন স্থান শূন্য থাকে না এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তৃতীয়তঃ বাইসিকেল্ ও মোটর। এই উভয়েই বিশেষতঃ প্রথমটীতে আরোহীই চালক সুতরাং শয়ন অসম্ভব। এমন কি ঘোড়ার গাড়িতেও শয়ন ক্লেশকর, কারণ স্থান অপ্রশস্ত। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গরুর গাড়ির ন্যায় শয়ন-সুখকর শকট আর নাই।

বাস্তবিকই গরুর গাড়ির রচনাকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পরমকারুণিক জগৎপাতা জগদীশ্বর জগতের ভবিষ্যৎ সন্তানদিগের নিমিত্ত বহুপূর্ব্বে কোন উর্ব্বরতম মস্তিষ্কে এই গোশকট-কল্পনার অবতারণা করেন, অথবা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্জ্জনে বসিয়া বিধাতার মানসকল্পিত গোশকটটীকে জড়দেহে অনুপ্রাণিত করেন। যাহা হউক, মর্ত্ত্যলোকে অস্তিত্ব-সংগ্রামে অবিলুপ্ত ও অপরিভ্রষ্ট শকটজাতির মধ্যে ইহাকে একরকম "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

গরুর গাড়ির আরও অনেক উল্লেখযোগ্য গুণ আছে; ধৈর্য্যচ্যুতি না হইলে একে একে বলিব; যদিও এ কথা সত্য যে সর্পরাজও সহস্র জিহ্বায় ইহার গুণরাশি বর্ণনা করিতে পারেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ।

অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, মানসরাজ্য সর্ব্বতো-ভাবে প্রাকৃতিক রাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের দর্শন পাঠ করিয়া গরুর গাড়ির আর একটী রহস্যোদঘাটন করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম যে, যদিও গোযানারোহী যাত্রী স্বভাবসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নেত্র-চরিতার্থতা-লাভ করিতে পারে না, তথাপি সে তদপেক্ষা মহত্তর রাজ্যে বিচরণ করিয়া সুবিমল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। কল্পনা-জগতের ন্যায় কলঙ্কলেশ-বিহীন, অপার-সৌন্দর্য্যময় জগত আর কোথায়? 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী ও কেবল সবল ইন্দ্রিয়েই প্রতিভাত; কিন্তু মানসিক সৃষ্টির সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী ও অনপনোদনীয়। আপনি গোশকটে শয়ন করিয়া কার্য্যান্তর অভাবে চিন্তাস্রোতে প্রশ্রয় প্রদান করুন, তাহার অবিরল চল্-চল্ প্রবাহের মধ্যে কত মানস-সম্মোহন চিত্র প্রতিবিম্বিত হইবে, কত অভিনব ছায়াপটে আপনার চিত্ত মকরন্দলীন মধুকরের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। আপনি বাহ্যিকশোভা কি দেখিবেন? তাহা'ত এক সময়ের ও এক স্থানের; কিন্তু অন্তরে চাহিয়া দেখুন, তথায় সকল রমণীয় দৃশ্য একত্র হইয়াছে, সকল ঋতু যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে। আপনি নক্ষত্রাবলী-শোভিত আকাশে পূর্ণশশীর উদয় দেখুন, আবার তখনই প্রাচীললাটে ঊষারাগচ্ছটার অলৌকিক আলোকে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন। আপনি দেখুন, অদূরে তুষার-ধবল হিমশিখর শৈলমালা দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহার উপত্যকাপ্রদেশে কত বিবিধ স্থলচর পশু বিচরণ করিতেছে, নিকটস্থ সরোবরের কাকচক্ষু সলিলে কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে,

এবং নানাবিধ বিচিত্রবর্ণের পক্ষিকুল উহার তটদেশে বিহার করিতেছে, দেখুন দেখি কল্পনা-প্রসূত এই মনোরম স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে আপনার ইচ্ছা হয় কি? অতএব মনোরাজ্যে আবদ্ধ রাখা কি যথার্থ বন্ধুর কার্য্য নয়?

অতএব দেখা যাইতেছে, গরুর গাড়ি জগতে একপ্রকার সংযম-শিক্ষার স্থল। মনকে একাগ্রবর্ত্তী করিতে ইহা অদ্বিতীয়। আপনার চিত্ত চিন্তা-তরঙ্গ-পরম্পরায় হাবুডুবু খাইতে থাক্, আপনি সেই তরঙ্গবিক্ষেপে একবারেই মগ্ন হউন; অর্থাৎ যদি নব্য বাঙ্গালী হন, তবে ক্রমান্বয়ে স্বদেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে থাকুন, যদি বৃদ্ধ হন, তবে দেশের বর্ত্তমান্ অবনতি, ধরিত্রীর অনুর্ব্বরতা ও যুবক-দিগের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে চিন্তাতৎপর হউন। আপনি এই গোশকটালম্বনে অতি অনায়াসেই গুরুতর যুক্তি ও তর্কের উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। যোগাভ্যাস ব্যতীতই আপনি একাগ্রচিত্ততা লাভ করিবেন। কিন্তু আর একটী কথা এই যে, চিন্তাস্রোতও অযথা পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। তাই, পাছে আপনি চিন্তাপ্রভাবে এতদূর অগ্রসর হন যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উদ্দামভাবে ছুটিতে থাকেন, অর্থাৎ ক্ষণোন্মাদ বা একেবারে বাহ্যসংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন; পাছে আপনি কল্পনাসূত্র এতদূর বিস্তার করিতে থাকেন যে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহার প্রতিসংহার চিন্তনীয় হইয়া উঠে, তাই শকট আপনাকে মধ্যে মধ্যে ঝাঁকিরূপ দিব্যশক্তিদ্বারা পুনরায় স্বাভাবিক স্থানে প্রত্যাগমন করাইবে।

এইরূপে ঘুঁড়ি যেমন ক্রমান্বয়ে রশ্মির শিথিলীকরণ ও আকর্ষণ পরম্পরায় ঊর্দ্ধগামী হয়, আপনিও সেইরূপ উন্নত হইতে থাকিবেন। অবশেষে ক্রমে যখন আপনার চিন্তাক্লিষ্ট অন্তঃকরণ অবসন্নপ্রায় হইবে, তখন সেই অনির্ব্বচনীয় চক্রধ্বনি শ্রবণপার্শ্বে অতি করুণস্বরে উদ্গীরিত হইয়া সর্ব্বদুঃখহারিণী নিদ্রাদেবীকে ডাকিয়া দিবে।

গরুর গাড়িতে যে কি পরিমাণ সুখ তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই একটী বিশেষ উপকরণের বিষয় বলিব; সেটী ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন, যথা—উচ্চ-নীচ বা বন্ধুর স্থানে গমনকালীন উত্থান-পতন। পল্লীগ্রামে প্রান্তরমধ্যে এরূপ উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী এবং গরুর গাড়িই ঐ সকল পথে একমাত্র ভরসা। কাজে কাজেই ঐ সুখটা একরকম গরুর গাড়িরই এক-চেটিয়া; যদি কখন আস্বাদন না করিয়া থাকেন তবে একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় অনেকেই কখন না কখন নাগর-দোলায় চড়িয়াছেন। নাগর-দোলা এক-পাক ঘুরিল, বেশ্ লাগিল, দুইপাক ঘুরিল, বড় মন্দ লাগিল না, তিনপাক ঘুরিল—আর কেন, এইবার নামা যাক্; হরি হরি! কিন্তু কমলি ছাড়ে কৈ? বোঁ বন্ বন্ শব্দে দোলা ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে "ত্রাহি মধুসূদন" পর্য্যন্ত গড়াইল, কিন্তু নীচে নামিবার সময়েই "ত্রাহি মধুসূদন", উপরে উঠিলেই 'আঃ কি আরাম' বলিয়া পুনরায় অবতরণের পূর্ব্বে ভাল করিয়া আঁটিয়া বসিয়া থাকিলেন। ক্রমে নামিবার পূর্ব্বের ভয় ও কষ্টটুকুও অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন কেবল আনন্দ; দুঃখটুকুও সুখের অঙ্গীভূত হইয়া সুখ হইয়া দাঁড়াইল।

কাজে কাজেই বারবার ঘুরিতে ইচ্ছা হয়। গরুর গাড়িতেও ঠিক ঐরূপ সুখ। একবার বোধ হইল বুঝি অচিরাৎ পাতালপুরীর অধস্তন-সীমায় উপনীত হইলাম, পাছে পিছন দিয়া পিছলাইয়া পড়ি এই ভয়ে শক্ত করিয়া বাঁখারী ধরিয়া রহিলাম; সঙ্গে সঙ্গে একটী বিশাল ঝাঁকি—এমন ঝাঁকি যে পায়ের অঙ্গুলী হইতে মেরুদণ্ডের প্রত্যেক হাড়টী পর্য্যন্ত তাহা অবগত হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দুঃখের নিশা দূর হইল, মনে হইল যেন নন্দনকাননে যাইবার জন্য স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিতেছি। ক্রমে ঐরূপ বার বার নিম্নে পতিত হইতেই আপনার ইচ্ছা হইতে লাগিল। কারণ কবিই গাহিয়াছেন,—"সে পতনে কিবা ক্লেশ উন্নতি যাহায়।"

যদি কেহ উত্থান-পতনের সুখ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, অথবা কেমন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একবার কোন পাড়াগেঁয়ে রাস্তায় হৃষ্টপুষ্ট-গো-সম্পন্ন গরুর-গাড়িতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করি; হাতে হাতেই প্রমাণ পাইবেন। যদি এরূপ প্রমাণগ্রহণে পরাঙ্মুখ হন এবং উহা কথামালার লাঙ্গুলহীন শৃগালের সুযুক্তির ন্যায় মনে করেন তাহা হইলে একটু দার্শনিকভাবে উহা প্রতিপন্ন করিব। এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সুখের অভাবেই দুঃখ এবং যে পরিমাণ সুখ তাহার অবর্ত্তমানে সেই পরিমাণ ক্লেশ, অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে বলে "যত হাসি তত কান্না"। এক্ষণ, গরুর গাড়িতে অবস্থান করিবার সময় উত্থান-পতনে কিরূপ সুখ হইয়াছিল তাহা গৃহে আসিয়া গাত্রবেদনা দ্বারাই অনুমিত হইবে,

এরূপ গাত্রবেদন যে ৩।৪ দিন সর্ষপতৈল মর্দ্দনেরও আবশ্যকতা হইতে পারে। যদি বলেন যে, সুখের হিসাবে কষ্টই যদি শেষে ভোগ করিতে হইল, তবে একেবারে সুখান্বেষণ না করাই ভাল, অথবা অল্প সুখ ভোগ করিয়া অল্পদুঃখ সহ্য করাই উচিত, তাহা হইলে বলি যে, ঐরূপ যুক্তি স্বভাববিরুদ্ধ। মানুষ তত দুঃখের দাস নয় যত সুখের দাস, সুখ যত জোরে আকর্ষণ করে দুঃখ তত জোরে প্রত্যাকর্ষণ করে না। তাই লোকে ফুল তুলিতে গিয়া হাতে কাঁটার বেদনা সহ্য করে, মধু ভাঙ্গিতে গিয়া মৌমাছির হুলের তাড়না সহ্য করে, লেখাপড়া শিখিতে গিয়া অমূল্য স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত ভগ্ন করে, এবং যাহারা লেখাপড়া শিখিতে কষ্ট স্বীকার করে না তাহারাও আপাতসুখের জন্য ভবিষ্যৎ দুঃখরাশি অগ্রাহ্য করে। সুতরাং মোটের উপর কথা এই যে, সুখ ও দুঃখ ঠিক বীজ-গণিতের যোগ ও বিয়োগ চিহ্নের ন্যায় সমপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়; সুখের মূল্য কিছু বেশী। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ সুখদুঃখহীন জীবন আমাদের নিকট প্রলোভনীয় নয় কেন? কেন আমরা দুঃখ লইতে অস্বীকৃত হইয়া সুখের আশাও বিসর্জ্জন দিতে পারি না? কারণ আমরা সমপরিমাণ দুঃখ সহিয়াও সমপরিমাণ সুখ লইতে প্রস্তুত, কারণ সম্পূর্ণ সুখদুঃখহীন জীবন বিষয়-লিপ্সা-নিরত মুমুক্ষু ও জড়-পদার্থেরই সাজে, সাংসারিক বুদ্ধিজীবীর নয়।

আর একটী কথা বলা আবশ্যক যে, যেমন অশ্বচালনা ইংরাজ জাতির মতে একটী প্রকৃষ্ট ব্যায়াম অর্থাৎ প্রত্যহ অশ্বচালনায় শরীর সবল ও কার্য্যকরী হয়, সেইরূপ প্রত্যহ গোশকট আরোহণ করিলে

উত্থান-পতনের দ্বারা উৎকৃষ্টরূপ রক্ত-সঞ্চালন হয়। এক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই গরুর গাড়ির আর একটী মাহাত্ম্য দেখিতে পাইবেন। উহাতে Activity ও Passivityর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, নিশ্চেষ্টতা ও সচেষ্টতার গঙ্গাযমুনার সঙ্গম, যেন আলোয় ছায়া অথবা বঙ্কিম বাবুর সেই চিরপরিচিত উজ্জলে মধুর।

এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিদায় লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা আর দু'একটী কথা মনে পড়িল যাহা এই স্বদেশীর দিনে না বলিয়া থাকিতে পারি না।

প্রথমতঃ—গরুর গাড়ি স্বদেশী জিনিষ; উহাতে অপবিত্রকর চামড়া বা তৈজস পদার্থের সংশ্রব নাই। অধিক কি একখানি খাঁটি (Typical) গরুর গাড়িতে একটী লোহার পেরেক খুঁজিয়া পাইবেন না। এক কথায়, উহা সম্পূর্ণ স্বদেশী বা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয়তঃ—উহা পরম পবিত্র ভারত-ললনাকুল-বন্দিত ভগবতীর অবতার-স্বরূপা গোজাতির দ্বারাই বাহিত হয়, সুতরাং এই শকট যে কত পূজনীয় তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি? রামায়ণেও পড়া গিয়াছে যে, রাবণের কোন সেনাপতি মায়া দ্বারা আপনার রথের অশ্বগুলি গোরূপে পরিণত করিয়া রামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। আরও দেখুন, যে গোক্ষুরোত্থিত ধূলিকণা অঙ্গে স্পর্শ হওয়ায় রাজরাজেশ্বর দিলীপও আপনাকে পবিত্র বোধ করিয়াছিলেন, সেই ধূলিকণা মাঠের মধ্যে যাইতে যাইতে কতবার আরোহীর অঙ্গে উড়িয়া পড়ে তাহার ইয়ত্তা কি? ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা?

শুধু এইজন্যই কি গরুর গাড়ি আর্য্যজাতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় হইতে পারে না? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, অবশ্যই পারে।

গরুর গাড়ির নামে হাইকোর্টে কোন মামলা রুজু হয় নাই, সুতরাং আমি যে প্রবন্ধটী লিখিলাম তাহা স্বভাব-প্রণোদিত! আমার অকপট প্রশংসা কোনরূপ স্বার্থবিজড়িত নহে অর্থাৎ আইনের ভাষায় আমি গরুর গাড়ির ব্রীফ্ লই নাই।

আমার প্রিয়ে।

(লালিকা)

মন আমার, সজনি আমার, ভার্য্যা আমার, আমার প্রিয়ে ;
কেনগো প্রেয়সি রেগেছ এমন, কেনলো প্রেয়সি কপাট দিয়ে ?
কেনলো প্রেয়সি বিগড়িত মন, কেনলো প্রেয়সি কাঁদ ফুঁসিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা তোমার, যায়নিতো তারে শ্মশানে নিয়ে।

কোরাস্
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না, আছ দিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা চেঁচায়ে ডাকে, কানে কি পশেনা গিয়ে,
কিসের কান্না, দেখগে রান্না কিসের ধন্না, আছ দিয়ে ?

কাঁদিছ যে তুমি ক্রুদ্ধ নীরবে, রুদ্ধ করিয়া কক্ষদ্বার
এখনো জুড়িয়া অর্দ্ধভবন নিশ্বাস ধ্বনি স্বনিছে যার,
ছোট ছেলে যার ক্ষুধায় কাঁদিল, মেয়েটা উঠিল সেও জাগিয়ে,
তুই কিরে নোস্ তাদের জননী, তুই কিরে নোস্ আমার প্রিয়ে ?

কোরাস্
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা চেঁচায়ে ডাকে, কানে কি পশেনা গিয়ে,
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ?

একদা যাহার বিক্রম হেরি শাশুড়ী ননদী পাইত ভয়,
সে কিনা আজিকে বাসন পত্র না ছড়ায় রাগে রাজ্যিময়।

রাগের কারণ বুঝিনা যাহার, খেতে কি গন্ধ হয়েছে ঘিয়ে,
নতুবা কেন এ ধূলায় শয়ন, মরে কি গিয়াছে সাধের টিয়ে ?

কোরাস্ { কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা চেঁচায়ে ডাকে, কানে কি পশেনা গিয়ে,
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ? }

চীৎকার করি মুরজ-মন্দ্রে ডাকিতে ডাকিতে গেল যে জান্
ছাড়না শয্যা, তুমি না উঠিলে, কে দিবে অন্ন, কে দিবে পান্ ?
অথবা তোমার ধূলায় আসন, হায় হায় হ'লো কাণ্ড কি এ ।
মা কি তোমাকে বকেছে ঝকেছে, এখন তবু সে আছে কি জীয়ে ?

কোরাস্ { কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা চেঁচায়ে ডাকে, কানে কি পশেনা গিয়ে
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ? }

যদিও প্রেয়সি বকেছে সে তোরে, কেঁদে কেন নিশি করিছ ভোর
কালই সকালে বাহির করিব বাড়ী হতে তারে করিয়ে জোর ;
মায়ে ঝিয়ে রবে, রেগোনা, রেগোনা, সবেত আমার একটা বিয়ে,
সাধ্যি আমার সাধনা আমার, লক্ষ্মী আমার আমার প্রিয়ে ।
(বুদ্ধি আমার ভরসা আমার, যা কিছু আমার আমার প্রিয়ে) ।

কোরাস্ { কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ?
জলজ্যান্ত ভর্ত্তা চেঁচায়ে ডাকে, কানে কি পশেনা গিয়ে,
কিসের কান্না, দেখগে রান্না, কিসের ধন্না আছ দিয়ে ? }

পঞ্জিকা।

হে আমাদের চিরসুলভ স্বদেশী গেজেট্ তোমাকে নমস্কার। তুমি কোন্ যুগ-যুগান্তের সুদূর শিখরদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া আজও আমাদের বঙ্গদেশকে সরস ও উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছ। তোমাকে যতই ভাবিতে যাই, ততই চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। তুমি এক অভূতপূর্ব্ব সামগ্রী, এক বিচিত্র সৃষ্টি। তুমি এত প্রকার বিভিন্ন ব্যাপারের সমষ্টি যে, তোমাকে এক কথায় এই বৈচিত্রময়ী বসুন্ধরার একখানি ছোটখাট নক্সা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তোমাতে কি নাই? আকাশের তারা হইতে আরম্ভ করিয়া শিলমোহরের নমুনা পর্য্যন্ত তোমার অঙ্গে বিদ্যমান। তোমার ভিতর টাইম্‌টেবল্ আছে, ডায়রী আছে, পোষ্ট-আফিসের তালিকা আছে, উল্কাতত্ত্ব আছে, পত্র লিখিবার প্রণালী আছে, ফুলেলার চিত্র আছে, ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে, পাট্টাকবুলতি আছে, ব্যাঙ্কবার্ত্তা আছে, জ্যোতিষবচন আছে, এমন কি দন্তমার্জ্জনের বিজ্ঞাপনটি পর্য্যন্ত আছে। আজকাল আবার তোমার পত্রে পত্রে সঙ্গীত, শীর্ষদেশে নীতিগর্ভ উপদেশ ও পশ্চাদ্ভাগে নানাপ্রকার আকস্মিক রোগের মুষ্টিযোগ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। কেবল গরু হারাইলে গরু পাওয়া কেন, যে কোন পশু বা অপশু হারাক্ না

কেন, তাহাই তোমার সাহায্যে খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে। তোমার সাহায্যে কি না গণনা করা যায়? গ্রহের স্ফুট, অক্ষাংশ, অয়নাংশ, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, সমুদ্রের জোয়ার, নদীর বান, মেঘের বৃষ্টি, মানুষের পরমায়ু, চোরের চৌর্য্য, কাহারও তোমার হাত হইতে নিস্তার নাই। তোমার হিসাবে না ধরা পড়ে এমন বস্তু সংসারে অতীব বিরল।

তুমি কোন্ কাজে না লাগিয়া থাক? কি যাত্রাকালে, কি আহারে, কি বিবাহে, কি শ্রাদ্ধে, কি শিক্ষায়, কি দীক্ষায়, কি গৃহনির্ম্মাণে, কি গৃহপ্রবেশে, কি নৌকাগঠনে, কি বাণিজ্যকরণে, কি ধান্যবপনে, কি বৃক্ষরোপণে, কি অলঙ্কারকরণে, কি অলঙ্কার-ধারণে, সকল বিষয়েই তোমার প্রয়োজন। তোমাকে ছাড়িয়া হিন্দুর কোনদিকে এক পা বাড়াইবার যো নাই। তোমার কি যে সে শক্তি! তুমি যেন কি এক বিরাট্ নাগপাশে আমাদের সমস্ত জাতিটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। বাঁধিয়া রাখিয়া ভালই করিয়াছ। তোমার গণ্ডীর ভিতর এখনও কতকটা আছি বলিয়া, আমাদের অস্তিত্বটুকু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে আমাদের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে সত্য, কিন্তু সে তোমার নাগ-পাশের নিষ্পেষণে নয়, আমাদের টানাটানি করিয়া বাহির হইবার চেষ্টায়। যাঁহারা জোরজবরদস্তি না করিয়া কৌশলে মাথা গলাইয়া বাহির হইয়া পড়েন, তাঁহারাও অনেকে পাশ্চাত্য-বিভীষিকার ভয়ে আবার তোমার নাগপাশের মধ্যে মাথা গলাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। অবাধ স্বাধীনতার সীমাহীন করালবদনের

মধ্যে প্রাচ্যসংস্কারাপন্ন বাঙ্গালী কি সহজে প্রবেশ করিতে পারে? আমি স্বচক্ষে কোন বিলাত-ফেরত ব্রাহ্মণকে গৃহের দরজা রুদ্ধ করিয়া গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে দেখিয়াছি। আর একব্যক্তি, যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আহারাদির বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তাঁহার পাচক যদি আজকাল ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু বা নবমীতে অলাবু রন্ধন করে, তাহা হইলে, তিনি উক্ত উড়িষ্যা-বাসীকে উর্দ্দু ভাষায় গালি দিয়া পাদুকা লইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হন। আমি অপর একজন ভদ্রলোকেরও একটি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি পূর্ব্বেও পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বে তিনি অতি দূরদেশে গমন করিতে হইলেও বাছিয়া বাছিয়া অশ্লেষা কিংবা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিতেন, কিন্তু আজকাল একমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে হইলেও বারবেলায় বাহির হইতে ইতস্ততঃ করেন। তা ছাড়া আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি একদিন তাঁহার কোন প্রতিবেশীর নামে একটি কর্জ্জের নালিশ রুজু করিতে যাইবেন, এমন সময় যাত্রাকালে তাঁহার মাথার উপর একটা টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল; তাহাতে তিনি সেদিনের জন্য কেন, আর কোন দিন সে নালিশ লইয়া আদালত অভিমুখে গমন করেন নাই।

আমাদের দেশের পঞ্জিকার সহিত তুলনায় বিলাতি পঞ্জিকা কি তুচ্ছ। বিলাতি পঞ্জিকায় মাস, বার, তারিখ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই অসম্পূর্ণ নাবালক পঞ্জিকা আমাদের সনাতন পঞ্জিকার স্থান অধিকার করিতেছে! কি

আক্ষেপের বিষয় যে, অনেকের বাড়ীতে গিয়া পঞ্জিকা চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের দেয়ালে গজালকরা ইংরাজী পঞ্জিকাখানি দেখাইয়া দেন।

হে অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকা! তুমি যে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যার ভাণ্ডার তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে লোকে সাধারণতঃ পাঁজি-পুথি শব্দটি ব্যবহার করে কেন? আর পাঁজি শব্দটিকেই বা পুথির আগে বসাইয়া দেয় কেন? ঠাকুরমার গল্পেও শুনিতাম যে, কোন হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের প্রতি যেদিন ভগবান্ সদয় হইলেন, সেদিন স্বর্গ হইতে তাহার সম্মুখে পাঁজি-পুথি পড়িল, এবং সে তাহা পড়িবামাত্র দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ হইয়া উঠিল। বেদবেদাঙ্গ পড়িল না, ষড়্দর্শন পড়িল না; পড়িল কিনা পাঁজি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুস্তকের মধ্যে পাঁজির আসনই সর্ব্বোচ্চ। না হইবেই বা কেন? পাঁজির প্রথমেই জগতের আদিকারণ পার্ব্বতীপরমেশ্বরের উল্লেখ আছে। হরপার্ব্বতী-সংবাদ কোন্ পঞ্জিকায় নাই? তার পর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক বিষয় নূতন পঞ্জিকা হইতে জানা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি, আর কোন্ পুস্তকে এমন বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে? কত বৎসর পূর্ব্বে কোন যুগ প্রথম আরম্ভ হয়, কোন যুগের মনুষ্যের দেহ কিরূপ, কোন যুগের ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপ, কোন যুগ কত বৎসর স্থায়ী, এ সকল তথ্য এমন সঠিক্‌ভাবে আর কোথায় পাইবেন? জগতের সৃষ্টি যে অনাদি ও অনন্ত তাহাও পঞ্জিকা হইতে জানা যায়। কলিযুগের পরই আবার সত্যযুগ আসিবে

এবং সত্যযুগের পূর্ব্বেই কলিযুগ ছিল এই চিরন্তন সত্যটি যাঁহারা অবধান পূর্ব্বক নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। একটি যে কোন ফল মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিয়া এই নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ করিতে হয়, কারণ বোধ হয় তাহা না করিলে পঞ্জিকা শ্রবণের কোন ফল হয় না। জলে জল টানে প্রবাদ আছে, সুতরাং ফলে ফল টানিবে না কেন?

অনেক নাস্তিক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রীয় সত্য বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, পঞ্জিকা-প্রণেতেরা গঞ্জিকাসেবী। গঞ্জিকায় ছোট একটি টান দিলেই নাকি পঞ্জিকা হইয়া যায়। পঞ্জিকাকারদিগের গঞ্জিকা-সেবনের প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা আমাদিগকে বলেন যে—"সত্য যুগের মনুষ্যেরা যে ২১ হস্ত পরিমিত ছিলেন, এবং সুবর্ণ ব্যতীত অন্য ধাতু ব্যবহার করিতেন না, তাহার নিদর্শন কি? যদি তাঁহাদের দেহের দৈর্ঘ্য আমাদের হস্তের ২১ হস্তই ছিল, তবে আমরা তাঁহাদিগের সন্তান হইয়া ৩।৷৹ হস্ত পরিমিতি হইলাম কেন? জগৎ কি ক্রমে সর্ব্বত্রই ছোট হইয়া আসিতেছে? তবে কি জীবজন্তু সমস্তই ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিতেছে? নিশ্চয়ই করিতেছে। আজকাল যেরূপ অশ্ব দেখিতে পাই সেরূপ অশ্ব তৎকালে থাকিলে তাৎকালিক পুরুষগণ কিরূপে অশ্বরোহণ করিতেন? যদি জীবজন্তু সমস্তই থর্ব্বাকার হইতেছে তবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষতলাদিও তদ্রূপ হইতেছে সন্দেহ নাই, কারণ তাহা না হইলে সত্যকালে অশ্বগবাদির তৃণ ভক্ষণ করা অসম্ভব হইত এবং মনুষ্যেরও ফলমূলাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি

করা কষ্টকর হইত। সুতরাং যদি বৃক্ষলতাও খর্ব্বাকার হইতেছে তাহা হইলে আমাদের নদ, নদী, পর্ব্বত সমুদ্রও সংকীর্ণায়তন হইতেছে এইরূপ মনে করাই সঙ্গত, এবং তাহা হইলে বাধ্য হইয়া পৃথিবীও ক্রমে খর্ব্বাকারা হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, কলির শেষে নাকি মনুষ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে; তখন পৃথিবীর ব্যাসও নিশ্চয় ৮০০০ মাইলের পরিবর্ত্তে ৮০ মাইল হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে বোধ হয় কলির শেষদিন পৃথিবী একটি সরিষার ন্যায় হইয়া, একটি তালফলতুল্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে।" এ সমস্ত কূটতর্কের ফল। "বিশ্বাসেতে মিলে সত্য তর্কে বহুদূর" এ কথা ত নাস্তিকেরা বুঝিবে না।

নাস্তিকের অনেক দোষ। তাঁহারা আরো অনেক দোষের কথা উল্লেখ করেন। যথা, একজন নাস্তিক একদিন বলিলেন যে, তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের একটী সোণার অঙ্গুরীয় ছিল। তিনি ঐ বস্তুটিকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন। কৌতূহল বশতঃ তিনি একদিন উহা আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যদিও তিনি অতিশয় শীর্ণ ও খর্ব্বাকার পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তথাপি ঐ অঙ্গুরীয়ের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিটিও প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি ইহাতে আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এইজন্য যে পুরুষপরম্পরা এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছিল যে, তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ একজন প্রকাণ্ড যোদ্ধা ছিলেন। ইহা হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ এই অনুমান করিলেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে মনুষ্যজাতির দৈর্ঘ্য ও আয়তন

আজকালকার মনুষ্যজাতির দৈর্ঘ্য ও আয়তন অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তাঁহার যুক্তি অবলম্বন করিলে এই দাঁড়ায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সকল যোদ্ধা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বর্ম্ম আজকাল একটি শিশুর অঙ্গেও আঁটিবে না। ইহা কি কখনও সম্ভবপর? সেই ভীমসেন ও সেই ঘটোৎকচ কি আজকালকার একটী শিশুর সমান? তাহা হইলে কি বেদব্যাসের মহাভারতও মিথ্যা, বেদব্যাসও মিথ্যা? আমি বুঝিলাম ভদ্রলোকের গল্পটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেহেতু শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। বুঝিলাম তিনি নাস্তিক, তাই শাস্ত্রে লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য ঐ স্বকপোল-কল্পিত গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, আর যদি গল্পটি সত্যই হয়, তাহা হইলেও তিনি যে তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের অঙ্গুরীয়টি পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিতে পারে অন্য কেহ তাহা সরাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অপর একটি অঙ্গুরীয় রাখিয়া দেয় নাই?

তার পর নাস্তিকেরা আরো বলেন যে—"যদি সত্যকালের মনুষ্য ২১ হস্ত পরিমিতই ছিল, তবে ভূগর্ভ হইতে তাহাদের অস্থি পঞ্জর কখনো না কখনো একখানা বাহির হইত বা তাহাদের এমন কোন একটা কীর্ত্তি জগতের উপর বিদ্যমান থাকিত যাহা আধুনিক মনুষ্য দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নয়। এজিপ্টের পিরামিডও ৩॥০ হস্ত পরিমিত মনুষ্যের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন যে, যাহারা দিল্লীর লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছে, পুরীর সমুদ্রে বাঁধ বাঁধিয়াছে, শোণ নদীর উপর

সেতু বসাইয়াছে, টাইটানিক জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে, একটা পিরামিড্ বা কলোসাস্ নির্ম্মাণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর একটা সেতু থাকিত বা হিমাচল তুল্য কোন কৃত্রিম পর্ব্বত থাকিত, তবেই বুঝিতাম যে, এককালে ২১ হস্ত পরিমিত মনুষ্য বিগুমান ছিল।" কেন, সমুদ্রের উপর কি সেতু নাই? রামেশ্বর সেতুবন্ধটা কি? ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মাঝখানে ওরূপ সেতু আজকাল কেহ করিতে পারে? আজকাল স্থানে স্থানে সেতুটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাই তাহার এক একটা অংশ এক একটা দ্বীপের মত দেখায়। আর পর্ব্বত যে একটাও তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণ কি? এখন, কি করিয়া চিনিবে কোন্টী তাঁহাদের কৃত, আর কোন্টী স্বাভাবিক? যদি বল যে, তাঁহারা পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া গেলে কি পর্ব্বতের গায় একটা নাম ক্ষোদাই করিয়া রাখিতেন না, তাহা হইলে বলি যে, তাঁহারা নামের জন্য তত লালায়িত ছিলেন না। তাঁহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তিও নামহীন থাকিত কিন্তু আজকাল যিনি চার পয়সা দামের একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনিও পুস্তকের প্রথম তিন খানি পাতায় নিজের নাম মুদ্রিত করিতে ছাড়েন না। তাঁহারা যদি আজকালকার মনুষ্যের মতই হইবেন, তবে একটা স্বাভাবিক পর্ব্বতের গাত্রে বড় বড় সংস্কৃত অক্ষরে "অমুক অব্দে অমুকের দ্বারা নির্ম্মিত" বলিয়া দুই এক লাইন ক্ষোদিত করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহারা সে ভণ্ডামি করিলে তোমাদের সাধ্য ছিল যে, তোমরা তাহা ধরিতে পার? তাহা হইলে তোমরা

তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে এবং আভূমি প্রণত হইয়া একবাক্যে বলিতে, "আমরা তাঁহাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অযোগ্য বংশধর"। কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের বংশধরেরা একদিন তাঁহাদেরই গৌরব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিবে; ভাবিলে বোধহয় অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন।

সত্যযুগের মনুষ্য সম্বন্ধে এইত গেল, এক দল নাস্তিকের কথা। আর একদল নাস্তিক আবার বিদ্রূপের মাত্রা বাড়াইবার জন্য বলেন যে, "সত্যযুগের মনুষ্যেরা ২১ হস্ত পরিমিত ছিলেন বলিয়া যে পঞ্জিকায় লেখা আছে তাহার অর্থ এই যে, আমরা যেমন আমাদের হস্তের ৩৷৷০ হস্ত পরিমিত, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদের হস্তের ২১ হস্ত পরিমিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দেহের সহিত হস্তের যে কি চমৎকার সৌসাদৃশ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে তাঁহাদের মস্তকাদি অন্যান্য অবয়বেরই বা আয়তন কিরূপ ছিল তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহারা শক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিজীবী প্রাণী ছিলেন বলিতে পার, কিন্তু তাঁহারা যে মনুষ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? মনুষ্যের আকৃতি না থাকিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিব কিরূপে? তাঁহারা হয়ত কোন এক নূতন প্রাণী ছিলেন, যাঁহারা বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই অতিকায় হস্তীর ন্যায় অস্তিত্ব-সংগ্রামে বিলুপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আধুনিক হস্তীদিগকে অতিকায় হস্তী হইতে ক্রমোদ্ভূত বলা যেরূপ ভ্রমাত্মক, আমাদিগকেও সেইরূপ তাঁহাদিগের বংশধর বলা ভ্রমাত্মক"।

"তার পর সত্যযুগের মনুষ্যেরা যে সুবর্ণ ব্যতীত অন্য ধাতু ব্যবহার

করিতেন না, তাহাও কি নিতান্ত অসম্ভব নয় ? তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও কি সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিল ? আর এত সুবর্ণ তাঁহারা তখন পাইতেন কোথা হইতে ? তখন কি ধনাঢ্য ব্যতীত দরিদ্র লোক ছিলনা ? তখন কি জগতে লৌহাদি নীচ ধাতু অপেক্ষা, সুবর্ণের পরিমাণ অধিক ছিল, আর সেই সকল সুবর্ণই কি কালপ্রভাবে লৌহে পরিণত হইয়াছে ? অথবা লৌহ ও সুবর্ণ কি পরস্পর স্থান বিনিময় করিয়াছে ? যদি তাহা স্বীকার না করেন তবে বলিতে হইবে যে, সুবর্ণের পরিমাণ অল্প থাকিলেও তাহা সুলভ ছিল, এবং লৌহাদিই মহার্ঘ ছিল। কিন্তু তাহা হইলে অর্থনীতির একটী চিরন্তন সত্য মিথ্যা হইয়া যায়।"

কি অসাধারণ ধৃষ্টতা এই সকল নাস্তিকদের ! তাহারা আপনাদিগের সংকীর্ণ অর্থনীতির সূত্রে জগতের সকল যুগকে বাঁধিতে চায় ! তাহারা মনে করে যে, যাহা আজকাল সত্য তাহা চিরদিনই সত্য ছিল এবং চিরদিনই সত্য থাকিবে। অঙ্কশাস্ত্রের সত্যের পর্য্যন্ত চিরন্তন স্থিরতা আছে কিনা সন্দেহ, আর এই কৃত্রিম অর্থনীতির সত্য চিরদিন স্থির থাকিবে ? হয়ত তখন প্রাচুর্য্য বা সৌন্দর্য্য মূল্যের নিরূপক ছিলনা, প্রয়োজনীয়তাই মূল্যের একমাত্র নিরূপক ছিল। কিন্তু হায় এ সকল কথা বুঝাই কাহাকে ?

যাই হোক্ পঞ্জিকার কথা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছি, এখন দুই একটা কাজের কথা বলি।

লোকে কথায় বলে 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার' ; ইহার অর্থ কি ? সাধারণ অর্থ অবশ্য এই যে, চাক্ষুষ প্রমাণ নিকটে থাকিলে, তর্ক-

বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। ঘরের কোণ হইতে পাঁজিখানি বাহির করিলেই যদি সমস্ত গোল মিটিয়া যায়, তবে, তিথি, বার লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার আবশ্যকতা কি? কিন্তু মঙ্গলবার বলার সার্থকতা কি? সোমবার বা বৃহস্পতিবার বলা হইলনা কেন?

আমি অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছি যে, মঙ্গলবারটি কোন বিশেষ বারের নাম নয়, উহার অর্থ মঙ্গলজনক বার। কোন কার্য্য করিতে হইলে মঙ্গল-বার দেখিয়াই করা উচিত। অমঙ্গল-বারে কার্য্য করিলে, কার্য্য পণ্ড হয় বলিয়াই অনেকের সংস্কার। কিন্তু অনেক সময়ই আমরা বাহ্য ঘটনা দেখিয়া দিবসের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে যাই, এবং ঠিক সেই সময় হয়ত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া বলেন, "অত গোলমালে কাজ কি? হাতের কাছেই যখন পাঁজি আছে, তখন আজ মঙ্গল-বার কি না তাহা জানিবার জন্য এত মাথা ঘামাইতেছ কেন? একবার পাঁজিটী খুলিয়া দেখ, সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে।" এইরূপ প্রসঙ্গেই নিশ্চয় "হাতে পাঁজি মঙ্গলবার" প্রবাদটী উত্থিত হইয়াছে।

কিন্তু আজকাল আবার সে গুড়েও বালি পড়িয়াছে। আজকাল আবার আমার হাতে যে পাঁজি, আপনার হাতে সে পাঁজি নাও থাকিতে পারে। আমি হয়ত চট্ করিয়া গুপ্তপ্রেস পাঁজিটী তাকের উপর হইতে পাড়িয়া ফেলিলাম, আর আপনি হয়ত ধাঁ করিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে পি, এম, বাক্‌চির পাঁজি বাহির করিয়া আনিলেন। আমি আমার পাঁজিখানি আপনার চক্ষের সম্মুখে ধরিলাম, আর আপনিও হাসিয়া আপনার পাঁজিখানি আমার চক্ষের সম্মুখে

ধরিলেন। উভয় পাঁজিতে অনৈক্য হইল। হয়ত আমার পাঁজিতে যেদিন মঙ্গলবার আপনার পাঁজিতে সে দিন সে বারই নয়। এখন মীমাংসা করে কে ? বরং আমরা দু'জনে তর্ক করিয়া একমত হইতে পারিতাম, কিন্তু এখন সে আশাও সুদূর-পরাহত। প্রমাণবলে বলীয়ান্ প্রতিপক্ষের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার প্রবাদটি আজকাল নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হে পঞ্জিকে! তুমি আমার শৈশবজীবনের উপর কি অলৌকিক প্রভাবই না বিস্তার করিয়াছিলে! তোমার সহিত এখনও আমার কত না সুখদুঃখময় কৈশোর-স্মৃতি বিজড়িত আছে। তোমাকে এখনও আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। তোমাকে দেখিলেই আমার মনোমধ্যে কত শত অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। সে ভাব অপরকে বুঝাইতে পারি না, কেবল অনুভব করি মাত্র। তোমারি ন্যায় কদর্য্য-কাগজ-বিশিষ্ট, উড্‌কাট-চিত্র-সম্পন্ন, বটতলা-মুদ্রিত অনেক পুস্তক আজকাল দেখিতে পাই, কিন্তু সে সকল পুস্তক দেখিলে মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তোমাকে দেখিলে তাহা হইতে এক স্বতন্ত্র ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে।

বাল্যকালে যখন আমি কোন অলস দ্বিপ্রহরে আমার কৌতূহল-পূর্ণ সাগ্রহ দৃষ্টি তোমার পত্রে পত্রে স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে পত্রগুলি উল্টাইয়া যাইতাম, তখন তোমার মধ্যে কত যে কল্পনার ভাণ্ডার আলাদীনের ভূগর্ভস্থ রত্নপুরীর ন্যায় আমার নয়নসম্মুখে উন্মোচিত হইত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তোমার

মধ্যে স্থানে স্থানে যে যষ্টিধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গের সহিত আমাদের শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়া, যুগপৎ ভীতি, ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম, মনে করিতাম যেন আমি সেই মসৃণমস্তক, চেলাঞ্চলধারী, যষ্টিসহায়, ব্রাহ্মণপ্রবরের মস্তকে, চক্ষে, কিংবা দক্ষিণ হস্তে স্থান পাই। সময় সময় তিনি যে কেবল চিত্রন্যস্ত তাহাও ভুলিয়া যাইতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাঁহার কোন অঙ্গে স্থাপিত করিয়া চাহিয়া দেখিতাম, তাঁহার কোন অঙ্গে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়াছি। মস্তকে অঙ্গুলি পড়িলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম, পদদ্বয়ে অঙ্গুলি পড়িলে একটা অতিশ্চিত উদ্বেগে অধীর হইয়া, বারবার তিনবার পর্য্যন্ত অদৃষ্টের ফলাফল পরীক্ষা করিতাম।

আবার তোমার ভিতর দেহহীন মুণ্ড, কুণ্ডলীকৃত সর্প প্রভৃতি নানা রহস্যপূর্ণ ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতাম। রাহু ও কেতু কি তাহা তখন বুঝিতাম না, কিন্তু তাহাদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আমার মনোরাজ্যে জুজু ও ছেলেধরার শূন্য সিংহাসনটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

আর তোমার ভিতর যে রাশিচক্র অঙ্কিত থাকে, তাহাতে ১২টী রাশির ১২টী বিভিন্ন চিত্র দেখিয়া মনে কত অদ্ভুত ভাবেরই সঞ্চার হইত। প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি জন্মরাশি থাকে তাহা জানিতাম, সুতরাং ভাবিতাম যাহার যে রাশিতে জন্ম সে সেই রাশিস্থ প্রাণী বা পদার্থের গুণসম্পন্ন হইবে। মেষরাশিতে যাহার জন্ম, তাহাকে মেষের ন্যায় পরানুগামী ও পরশক্তিচালিত এবং কোন

জাতীয় প্রবচনের বলে, ইংরাজীতে যাহাকে কুক্কুট-চঞ্চুাহত বলে তাহাই অনুমান করিতাম। বৃষরাশির পুরুষকে, ষণ্ডামার্ক বা গোঁয়ারগোবিন্দ বলিয়া স্বতই মনে হইত। এইরূপে মিথুনরাশিস্থ পুরুষকে রমণীপ্রিয়, কর্কটরাশিস্থ পুরুষকে নাছোড়বান্দা ও মুখসর্ব্বস্ব, সিংহরাশিস্থ পুরুষকে প্রতাপশালী, সাহসী ও উদারতাপূর্ণ, কন্যা রাশিস্থ পুরুষকে, স্ত্রী-স্বভাবাপন্ন, তুলারাশিস্থ পুরুষকে লঘুস্বভাব, বৃশ্চিকরাশিস্থ পুরুষকে, ঈর্ষাপরায়ণ, ধনুরাশিস্থ পুরুষকে, তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্রগতি, মকররাশিস্থ পুরুষকে গোপনানিষ্টকারী, কুম্ভরাশিস্থ পুরুষকে গম্ভীরাকৃতি ও গম্ভীর-নাদী এবং মীনরাশিস্থ পুরুষকে অবগাহন-প্রিয় ও সন্তরণ-পটু বলিয়া মনে করিতাম। সে সকল ধারণা আজ কত বৎসর হইল তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু রাশিচক্রটী দেখিলেই পূর্ব্বেও আমার হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হইত, আজও ঠিক্ তাহাই হইয়া থাকে।

চটি-বিলাপ।

—:*:*:—

(ভট্টাচার্য্যের চটি-চুরি উপলক্ষে)

১

হে আমার চটি !
কিনিয়াছিলাম তোমারে যে আমি
বাঁধা দিয়ে ঘটী।
মনে নাই কিহে তালতলা গিয়া
কিনিনু তোমারে এক টাকা দিয়া,
এবে কোথা তুমি যাইলে চলিয়া
মোর পরে চ'টি ?
কোন্ অপরাধে হইলে নিদয়
হে আমার চটি ?

২

হে চরণ-যান !
তোমার লাগিয়া খুঁজেছিনু আমি
কত না দোকান ;
কত না জুতারে ঠেলিয়া চরণে,
নির্ম্মিত কত নূতন ধরণে,

তোমাতেই শেষে করিলাম হেসে
এ চরণ দান,
ভুলে কি গিয়েছ সে সকল এবে
হে চরণ-যান ?

৩

হে পদ-বাহন !
যদিও তোমার মূল্য কেবল
একটি কাহন,
যদিও তোমার দেহ ত্রিভঙ্গ
কমঠ-কঠিন শ্রীহীন অঙ্গ
বলে সবে, তবু তোমারি সঙ্গ
করি আবাহন ;
হে পদ-বাহন !

৪

হে চটি-প্রবর !
পাঁচ বছরের ভালবাসাটিরে
দিলে কি কবর ?
তোমারে লইয়ে কত দেশ দেশ
ফিরিয়াছি আমি দীনহীন-বেশ,
তোমারে দেখায়ে দু'পয়সা বেশ
পেয়েছি জবর,
তোমারি অটল ধৈর্য্যের গুণে
হে চটি-প্রবর !

৫

হে জুতা-রতন !
পারি নি তোমারে কখনত আমি
করিতে যতন,
তবু তুমি মোর লাগিয়া সতত
বৃষ্টি ও কাদা মাখিয়াছ কত,
সহিয়াছ কত কণ্টক-ক্ষত
সাধুর মতন ;
তার চেয়ে বেশী কি হয়েছে আজ
হে জুতা-রতন !

৬

পাদুকে আমার !
কার প্রলোভনে ভুলিলে আমারে,
কোন্ সে চামার ?
যেই হোক্, তুমি যারি সনে যাও,
যত কম হাঁট, যত সুখ পাও,
যত তেল মাখ, রৌদ্রে শুকাও,
তবু বিনামার
বেশী সে তোমারে বলিবে না কভু,
পাদুকে আমার !

৭

হে মোর বিনামা !
বিনামা হ'লেও গরীবের তুমি
সোণা, রূপা, তামা ।
ধুতি, ছাতি, ব্যাগ, নস্যের দানি
আর তোমাকেই সম্বল মানি
ছিনু এতদিন, কখনো না জানি
মোজা কোট্ জামা ;
তবুও আমারে ছাড়িলে কি হেতু
হে মোর বিনামা ?

৮

বন্ধু হে মম !
পৃষ্ঠেতে নহ, কিন্তু চরণে
তুমি অনুপম ;
তোমার মূরতি সদা মনে জাগে,
রিক্ত চরণে যবে ব্যথা লাগে,
যবে মনে পড়ে কত অনুরাগে,
সুন্দরতম
বর্ম্মের মত চর্ম্মে রাখিতে
বন্ধু হে মম ।

৯

হে আমার চটি !
পথে ঘাটে আমি এখনো তোমার
গৌরব রটি ;
থাকিলে আমার, শত তালি দিয়া
পরিতাম তোমা, কিন্তু চলিয়া
গেছ যার সনে তোমারে ফেলিয়া
দিবে সে কপটী,
যেমনি খসিবে দেহের বাঁধন
হে আমার চটি !

ঢেঁকি।

—:*:—

"পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের উপর এখনও যেরূপ দৌরাত্ম্য চলে, তাহা জানিলে কিছুতেই বলিতেন না যে, আমাদের অদৃষ্ট একটুও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটু মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা যৎসামান্য; মোটের উপর আমরা 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'। দেশে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কত বড় বড় মনীষী জন্ম গ্রহণ করিলেন, কত পুরাতন পদ্ধতি দূর হইল,—কত কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হইল, কিন্তু আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। ইন্দ্রবাবু বিলাত হইতে বিরাট্ ব্যারিষ্টার আনাইয়া কাঁকড়ার দুঃখ দূর করিলেন, কিন্তু আমাদের অনুযোগটা তিনি উল্লেখ করিলেন না। মাসিকে সাপ্তাহিকে লোকের কত অভাব দূর করিবার জন্য কত মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জন্য কিছুই হইতেছে না, যেন আমরা সমাজের কেহই নই। আমরা না থাকিলে সমাজের এখনও যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা আর বলিয়া কি করিব। দেশের লোকের উপরে আর বড় ভরসা নাই, বরং ভরসা আছে বিদেশবাসীর উপরে। যে বিদেশী জাতি সভ্যতার লণ্ঠন ধরিয়া কত পুরাতন ভ্রমাচ্ছন্ন ইনষ্টিটিউটকে কণ্টকের ন্যায় দেশের বক্ষ হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন, ইউরোপ হইতে দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ করিয়াছেন, তিনি কি আমা-

দের প্রাণবিচ্ছেদ হইতেছে, তাহা দেখিবেন না? পরপদানত হইয়া কেবল পরসেবাতেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়, কিন্তু বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা যে, আমাদের উপর কাহারও সুদৃষ্টি পড়িল না। ভাবিবেন না, যে আমরা পরের কার্য্য করিতে স্বভাবতঃই পরাঙ্মুখ,—কারণ তাহা হইলে ত আমরা বর্ব্বরের একশেষ। পরের অবলম্বন না লয়, পরমুখাপেক্ষা না করে এমন কে আছে? পর হইতেই আমরা সংসারে আসি, চলিতে, কথা কহিতে শিখি, পর হইতেই মনুষ্যত্বের ও উচ্চবৃত্তির আবির্ভাব হয়,—পর ভিন্ন আনন্দ হয় না, পর ভিন্ন দুঃখের লাঘব হয় না; পরের জন্য খাটিব না ত খাটিব কার জন্য? আমি সমাজদ্বেষী নই, তবে সববিষয়ে স্বেচ্ছা ও স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। এমন করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া কার্য্যে নিয়োজিত করা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। আমাদের এমনই ভাবে রাখা হয়, যেন আমরা কেবল মনুষ্যের বেগারের জন্যই সৃষ্ট, যেন আমাদের দ্বারা আর কোন উচ্চকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। নাই থাক্, কিন্তু আমরা যাহা করি, তাহা অনুচ্চ কিসে? যদি প্রয়োজনের হিসাবে কার্য্যের মূল্য নির্ণীত হয়, তবে আমাদের কার্য্য যথার্থই অমূল্য আপনাদের সাহিত্যকুলতিলক বঙ্কিমবাবুই ত বলিয়াছেন, আমরা "আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র, কারণ একমাত্র পিণ্ডাধিকারী"। কিন্তু মানুষ এতই কৃতঘ্ন ও কুৎসাকারী যে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। ইহা বড় নির্ম্মম বিদ্রূপ, লাইবেল্ বলিলেও চলে। মানেটা আর কিছুই নয়,—আমরা যতই বড় হই না কেন, আমাদের ললাটলিপি যে ধান ভানা, তাহার খণ্ডন

নাই। বলি ভাই, ধান ভানাটা কি এত গর্হিত কার্য্য? উহা নহিলে যে তোমাদের প্রাণধারণের উপায় নাই। আমরা পরিশ্রম করিয়া তোমাদের অন্নসংস্থান করিয়া দিই, তাই বুঝি আমাদের এত তিরস্কার? আজকাল পরিশ্রমের কার্য্যমাত্রই, কেন জানি না, লজ্জাজনক হইয়া পড়িয়াছে,—নতুবা ধান ভানা কথাটার মধ্যে এমন কি হীনতা আছে যে, শুনিবামাত্রই প্রত্যেক বাঙ্গালীর মুখ আকুঞ্চিত হইয়া উঠে? যাই হউক, এ সমস্তই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। মহাশয় কিছু মনে করিবেন না। আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত ও বিশ্বাসী বোধ করিয়া এবং একান্ত নির্জ্জনে পাইয়াই এই কয়েকটি কথা বলিলাম।"

এই বলিয়া ঢেঁকি চুপ করিল। দেখিলাম রাগে ও ক্ষোভে তাহার মস্তকের নিকটস্থ অক্ষিগোলক দুইটা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

আমাদের ঠিক্ মধ্যে একটি মৃন্ময় প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আলোকটি আমার কন্যার প্রদত্ত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমার চণ্ডীমণ্ডপে, গোয়ালঘরে, ঢেঁকিশালায় ও পুষ্করিণীর পাড়ে এক একটি করিয়া প্রদীপ দিত। রাত্রিতে বড় গরম হইল, বিছানায় টেঁকা গেল না, উঠিয়া দেখি, এক গা ঘাম হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আকাশ মেঘে মোড়া, বাতাসের চলাচল নাই। কি করি, শিয়রে একখানি পুস্তক রাখিতাম, সেইখানি হাতে করিয়া পাইচারি করিতে লাগিলাম। তাহাতেও গ্রীষ্মের লাঘব হইল না; তখন আস্তে

আস্তে ঢেঁকিশালার কাছে গিয়া দেখি যে, প্রদীপটি তখনও জ্বলিতেছে, একটু তেলও আছে। মনে হইল রাত্রি তখন ৩টা। বসিয়া বসিয়া বইখানি খুলিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিলাম। বইখানি আমার বড় আদরের, নাম "রোমোলা"। একটি অধ্যায় পড়িয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। হঠাৎ চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি, কিছুই নয়। ভাবিলাম, ও কেবল শুনিবার ভ্রান্তি; নিদ্রা না হওয়ায় মাথাটা কিছু গরম হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আবার 'রমেশ'বাবু বলিয়া শব্দ হইল। এইবার ভাল করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করায় নিশ্চয় বোধ হইল যে, ঢেঁকিই আমাকে ডাকিতেছে। কিছু থতমত খাইয়া ভাবিলাম, ঢেঁকির কি প্রাণ আছে, কিন্তু সম্মুখের ঢেঁকিমূর্ত্তিটিকে এরূপ জীবন্ত দেখিলাম যে, উহাকে অচেতন বলিয়া সন্দেহ করাটা একেবারেই অসঙ্গত বোধ হইল। উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "কি বলিতেছেন?" ঢেঁকি বলিল, "আমার একটা কথা শুনিবেন কি?" আমি বলিলাম, "অবশ্য শুনিব"। তখন দুই এক কথার পর ঢেঁকি আপনার আত্মকথা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঢেঁকি যাহা বলিল তাহা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল; আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমার নিকট সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে, আপনার অনুযোগের যথেষ্ট কারণ আছে বটে"।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর ঢেঁকি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আপনি বোধ হয় আমাকে পরিহাস করিতেছেন না?" আমি

উত্তর করিলাম, "এরূপ সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। হে ঢেঁকিপুঙ্গব! হে ঢেঁকিচূড়ামণে! আপনি যে সুন্দর যুক্তি ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনুষ্যমধ্যেও বিরল। আপনি আজ আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, এক নূতনদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। আপনার আর যাহা বক্তব্য আছে, বলুন। আমি সমাজসংস্কারক দলের একজন নেতা ও পশু-পক্ষি-স্থাবর-জঙ্গম-ক্লেশ-নিবারিণী সভার সভ্য। আমি থিয়জফিষ্ট সোসাইটীরও একজন মেম্বর এবং ডাঃ জগদীশ বসু কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত সকল দ্রব্যেরই প্রাণ আছে, এই মতের প্রথম সমর্থক। আমি কল্যই পশ্বাদিক্লেশনিবারিণী সভায় এক বিরাট্ রেজোলিউসন্ মুভ্ করিব।"

দেখিলাম ঢেঁকি যেন কতক আশ্বস্ত হইল,—বুঝিল তাহার বাক্য গুলি বৃথাস্থানে পড়ে নাই। সে যেন সন্তোষের সহিত পুনর্ব্বার বলিল—"মহাশয়, তবেই দেখুন, জগতে ঢেঁকি দ্বারা কত না উপকার সাধিত হয়। হইতে পারে আমরা ক্ষুদ্র, কিন্তু আপনি যদি বার্ক ও মিল্ ভাল করিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে মহৎও ক্ষুদ্রের উপর নির্ভর করে, কারণ ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্যও লোক চাই। আর ক্ষুদ্রের দ্বারাও অনেক সময় মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয়। আর ইহাও সত্য যে সময়ানুসারে ও অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র কার্য্যেরও মূল্য অনেক বৃহৎ কার্য্য হইতে অধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই মনে করুন, আপনাদিগের বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় সভাসমিতি অপেক্ষা একটি ছোট কারখানা দ্বারা অধিক উপকার হইয়াছিল। সময়ানুসারে প্রত্যেক ছোট জিনিষই যে বৃহৎ হইয়া

দাঁড়াইতে পারে, তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে কত না দেখিয়া থাকি। একটি সামান্য ছোট কথা যাহা বন্ধু বন্ধুকে হাস্য পরিহাসচ্ছলে বহুবার বলিতে পারে, তাহাই সময়বিশেষে কোন কুসুম-পেলব হৃদয়কে গ্রীষ্মকালীন মাঠের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিতে পারে।"

আমি—"কিন্তু আপনাদের নামে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, যাহা বড় গৌরবজনক নয়।"

ঢেঁকি—"সেটি কি।"

আমি—"ঘরে থাকিয়া সময়ে সময়ে আপনারা কুমীর হন।"

ঢেঁকি—"সে আমরা নয় আপনারা। আপনাদের মধ্যে এক প্রকার মনুষ্য ঢেঁকি আছেন, তাঁহাদের প্রতিই উহা প্রযুজ্য। তাঁহারা নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় একপার্শ্বে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পরের স্বার্থপেষণই তাঁহাদের ব্যবসায়। আপনি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছেন, অতল জলে পড়িয়াছেন অমনই আপনার মামাত ভাই ঢেঁকিটি কুমীর হইয়া আপনাকে টানিতে লাগিল, পাছে আপনি সাঁতারাইয়া পার হন! আপনি ছেলেটিকে বেশ লেখাপড়া শিখাইতেছেন মানুষ হইলেও হইতে পারে, অমনই আপনার প্রতিবেশী ঢেঁকিটি গোপনে ইয়ারকি-দংষ্ট্রা দ্বারা তাহার মস্তক চর্ব্বণ করিতে লাগিল। আপনার একজন আত্মীয় জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, আর অমনি একটি ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া পুলিসে খবর দিল যে, খুন হইয়াছে। কিন্তু জানিবার উপায় নাই, পর মুহূর্ত্তেই ঢেঁকিশালে আসিয়া গড়ে নাকটি গুঁজিয়া পড়িয়া

আছেন। আমাদের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা গোপনেও কাহারো অনিষ্ট করি না, প্রত্যক্ষেও করি না। হইতে পারে ক্বচিৎ কদাচিৎ অনবধানতাবশতঃ কোন বৃদ্ধার হস্ত আমাদের মুষলে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ঢেঁকিবংশে এমন কুলাঙ্গার অতি অল্পই আছে যে কোন তরুণীর চম্পকদামসদৃশ অঙ্গুলি-কোরকে কখনও ব্যথা দিয়াছে।"

আমি—"তবে ত আপনারা অতিশয় সাত্ত্বিক ?"

ঢেঁকি—"সাত্ত্বিকতা যে আমাদের রক্তে প্রবাহিত, আমাদের যে বংশে জন্ম, তাহাতে এরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

আমি—"আপনাদের বংশ! আপনাদের বংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইতেছে।"

ঢেঁকি—"বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে ঢেঁকি নারদের বাহন। আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহার নামটি ঠিক মনে নাই, তিনিই নারদ ঋষির বাহন ছিলেন। সুবিধার জন্য তাঁহাকে আদম্ ঢেঁকিই বলিব কারণ আদম্ 'আদিম' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। তিনি কিরূপে বাহনত্বে নিযুক্ত হন, তাহা সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা ইন্দ্রাদিপ্রমুখ তেত্রিশ কোটি দেবতা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, প্রত্যেকের এক একটি বাহন না থাকিলে আর মানসম্ভ্রম রক্ষা করা যায় না। নরলোক হইতে যজ্ঞাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আসে বটে, কিন্তু পদব্রজে যাওয়া বড়ই কষ্টকর, এমন কি অনেক সময় অসম্ভবও হইয়া উঠে। অথচ, আহুতি গ্রহণ না করিলেও চলে না। অতএব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট আবেদন

করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণুর নিকট আবেদন করিলে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া প্রত্যেকের একটি উপযুক্ত বাহন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সকলে বাহন লইয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলে পর নারদ ঋষি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া নারায়ণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন ও অশ্রুগদ্‌গদস্বরে কহিলেন—"প্রভো! আমার জন্য কি বাহন নির্দ্দিষ্ট হইল? আমি যে আর টঙস্ টঙস্ করিয়া ত্রিভুবন ঘুরিতে পারি না দয়াময়! অথচ যত নিমন্ত্রণ, যত দৌত্য, পৌরোহিত্য ও ঘাটকালীর কার্য্য, সমস্তেরই ভার আমার উপর।" নারায়ণ চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, "জীবজন্তু ত সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছে, এক্ষণ তোমাকে কি দিব? আচ্ছা, ঢেঁকিই তোমার বাহন হইবে।" এই বলিয়া নারায়ণ কক্ষাভ্যন্তর হইতে এক বীরাবতার মূর্ত্তি বাহির করিয়া দিলেন। নারদ হাসিয়া কহিলেন, "উত্তম হইয়াছে ঠাকুর, আমিও যেরূপ কিম্ভূত বাহনটিও তদ্রূপ কিমাকার।

কিন্তু সেই 'আদম' ঢেঁকি 'আকারসদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" ছিলেন না। তিনি বিদ্বান্, নম্র ও কোমলহৃদয় ছিলেন। ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় তিনি কখনও কল্পদ্রুমের শাখা ভগ্ন করিতেন না, শিবের ষণ্ড বা যমের মহিষের ন্যায় নন্দনবন-ভ্রমণনিরতা সুরনর্ত্তকীর পশ্চাৎ শৃঙ্গোত্তোলন-পূর্ব্বক ধাবিত হইতেন না, ব্রহ্মার রাজহংসের ন্যায় বিসকিসলয় তুলিয়া মন্দাকিনীর স্বর্ণকমলোদ্যান উজাড় করিতেন না, বিষ্ণুর গরুড়ের মত বজ্রকঠোর চঞ্চুর ঠক্কোরে নাগকুল অথবা পক্ষিকুলের জীবনের উপর ধারাবাহিক ইন্‌কম্ ট্যাক্স বসাইতেন না,

অথবা জগদ্ধাত্রীর সিংহের ন্যায় দিগ্‌গজ দশটার কুম্ভ বিদারণ করিবার জন্য বার বার তাঁহার নিকট দুই এক দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিতেন না। 'আদম' ঢেঁকির কোন প্রকার জীবহিংসা বা অত্যাচার ছিল না। যদি কাহারও উপর তাঁহার আক্রোশ ছিল, তবে সে নারদ ঋষির বীণাযন্ত্রের উপর, কারণ উহার সুরটা তাঁহার বড় বদ্ লাগিত।

তিনি সুপুরুষ না হইলেও দেখিতে নেহাৎ মন্দ ছিলেন না। প্রথমে সুন্দর মাংসলই ছিলেন। ক্রমে দিনান্ত-পর্য্যটনে শরীর শুকাইয়া যাইতে লাগিল, হাড় ও গ্রন্থি সকল দেখা দিতে লাগিল। কালক্রমে তিনি 'দারুভূতো মুরারিঃ' হইলেন। তা ছাড়া নারদ ঋষির অনবরত আশীর্ব্বাদ—'বৎস! তোমার দেহ কাঠের ন্যায় কঠিন ও কষ্টসহিষ্ণু হউক'। আর যায় কোথা, তিনি সত্য সত্যই কাষ্ঠ হইলেন।"

আমি—"সে যাহা হউক, আপনার আসল বক্তব্য সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার আছে বলুন।"

ঢেঁকি—"হাঁ, তাই বলিতেছি। মনুষ্যের আচরণ সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল। কিন্তু মনুষ্য কেন আমাদের প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণ করে, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহারা আমাদের নামে কত মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু আমরা 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এই নীতি অনুসারে কার্য্য করি। এই দেখুন, তাহারা বলে "এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয় মাথা ধরে।" ঐ কথাতেই ত আমরা এত ব্যথা পাই। যদি মাথা ব্যথাই হইবে, তবে অবলাকুল কানে

তুলা না দিয়া ধান ভানিতে আসেন কিরূপে? আমরা পরহিতব্রত অবলম্বন করিয়া আছি, অথচ তাহাও মানুষ সহ্য করিতে পারে না; তাহারা আমাদের হীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ও অবমাননার জন্য বিলাতী কলকজায় 'Paddy husking machine' প্রভৃতি কল প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু তথাপি মনুষ্য আমাদের সাহায্য লইতে বিরত হয় কৈ? কল আমাদের প্রতিযোগী হইবে? শুনিয়া হাস্য রোধ করা যায় না যে। কৃত্রিম বুদ্ধি-নির্ম্মিত যন্ত্র কি কখন আমাদের স্থান অধিকার করিতে পারে? ঝরণা আর কৃত্রিম উৎস? পাহাড় আর মাটির ঢিপি? ধানভানা কলে ত আর হলুদ গুঁড়া হয় না, কিন্তু আমাদের দ্বারা ধানভানা হইতে হলুদগুঁড়া, তামাকমাখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই নিষ্পন্ন হয়। এইটুকুই আমাদের বিশেষত্ব।

মনুষ্যগণ মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলে, যাহা আদৌ সদিচ্ছা-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয় না। অতিশয় মূর্খ ব্যক্তিকে অনেক সময় 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বলা হয়। বোধ হয় বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্থূলত্ব কি কেবল আমাদেরই আছে? গ্রহ উপগ্রহ আছে, পর্ব্বত আছে, শালবৃক্ষ আছে, গজমহিষাদি আছে, কিন্তু আমাদিগকে কি হেতু ঐরূপ অযাচিত সম্মানে সম্মানিত করা হয়, তাহা বলিতে পারি না। স্থূলত্ব ব্যতীত যদি অন্য কোন সাদৃশ্যও অভিপ্রেত হয়, তবে সেটি কি, বলিয়া দিবেন কি?"

আমি—"আপনি যে কারণ দেখাইলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যদি মনঃক্ষুণ্ণ না হন, তাহা হইলে আমি আর একটি কারণও

দেখাইতে পারি। আপনাদিগের রূপ আপনাদিগের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যচক্ষে আপনারা কদাকার ও ত্রিভঙ্গকলেবর। সুতরাং বুদ্ধি বিকৃত ও অসমান হইলে তাহাকে ঢেঁকির সহিত তুলনা দেওয়া অসঙ্গত হয় না।"

ঢেঁকি—"আপনার স্পষ্টবাদিত্বে আমি বাধিত হইলাম, কিন্তু আমার আর একটি সংশয় আছে। লোকে বলে "উপরোধে ঢেঁকিও গেলে,"—এ কথার তাৎপর্য্য কি ?"

আমি—"পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই আপনার বোঝা উচিত ছিল যে ঢেঁকি, মানুষের চক্ষে ঠিক হজমী গুলির মত একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল মসৃণ পদার্থ নয়; সুতরাং উহার গলাধঃকরণ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অতএব যে ব্যক্তি উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে পারে, সে উপরোধে সকল কার্য্য করিতেই সমর্থ।"

ঢেঁকি—"তবেই দেখুন মানুষ আমাদিগকে কত না হেয়জ্ঞান করে! অথচ আমরা কত পরোপকারী, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যাহা হউক নিজের মুখে আর নিজের গুণ ব্যাখ্যা করিব না, কি জানি আপনি আমাকে অন্তঃসারশূন্য আত্মাভিমানী মনে করিতে পারেন। তবে আজকাল আর ভাল মানুষের দিন নাই। আজ কাল কেবল উচ্চকণ্ঠে আত্মঘোষণা করিতে পারিলেন ত বাঁচিলেন, নতুবা অস্তিত্ব-সংগ্রামে ছোট বুদ্‌বুদ্‌টির মত টুপ্‌ করিয়া ডুবিয়া গেলেন। তখনও যদি ডুবিয়া ডুবিয়া দু'চারিটি কথার ভুড়্‌ভুড়ি ছাড়িতে পারেন, তবে লোকে টের পাইবে, নতুবা খোঁজও হইবে না। এই দেখুন, আপনাদের আজকাল যেরূপ অবস্থা, তাহাতে

আপনারা বাঁচিয়া আছেন কিসে? সে কেবল তিনটি গুণে। প্রথমতঃ আপনাদের সংবাদপত্রে আন্দোলন, দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতাতে আস্ফালন, তৃতীয়তঃ আপৎকালে পলায়ন। এ তিনটি গুণ যাহার আছে, সে আর কিছু না হউক, অন্ধকারে পদদলিত হইয়া মরে না।”

এইরূপে দীর্ঘ বক্তৃতা সমাপন করিয়া ঢেঁকি নীরব হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনাদিগকে যাহারা, ক্রীতদাসের ন্যায় বলপূর্ব্বক কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহাদিগের চেষ্টার বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদ করেন না কেন? কাপুরুষের ন্যায় নির্ব্বিবাদে পরপীড়ন সহ্য করেন কেন?”

ঢেঁকি—“কারণ আমরা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত,—আমাদিগের হৃদয় একটু ভাবপ্রবণ ও কবিতাময়। যে কার্য্য আপনি মাথা খুঁড়িয়াও করাইতে পারিবেন না,—সেই কার্য্যেই, যখন ললিত-লবঙ্গলতা, অপরাজিতা, বসন্তের কচিপাতা প্রভৃতি দিব্য নাম-ধারিণীদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হওয়া যায়, তখন না করিয়া থাকা যায় না, এবং কোন্ ভদ্রলোকই বা থাকিতে পারে? শেষে কি ‘gallantry’র অপমান করিয়া অসভ্য বলিয়া পরিচিত হইব?”

আমি—“উত্তম বলিয়াছেন, কিন্তু বামী, শ্যামী প্রভৃতি বিগত-যৌবনা, গলিতদশনা পক্ককেশীগণ পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলেও কি তাহাদের কার্য্য করিতে হইবে?”

ঢেঁকি—“ওটা সামিলে করিতে হয়, নতুবা আমাদের রমণী-সম্মানটা একটু দুষ্য হইয়া পড়ে। যাই হোক্, মানুষেরা বড় চতুর। তাহারা আমাদের প্রকৃতি বুঝিয়াই ঢেঁকিসাধ্য কার্য্যে রমণী নিযুক্ত

করে। এ বিষয়ে ভারতবাসিগণ ইংরাজজাতির চমৎকার অনুকরণ করিয়াছে। সুসভ্য ইংরাজজাতি দোকানের দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ একজন মিস্ বা অনূঢ়া সুন্দরীকে নিযুক্ত করে, কারণ তাহারা জানে যে, সুন্দরীদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-কটাক্ষ-পরিপূর্ণ সহাস্য অনুরোধ ক্রেতার উপর প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। উহা অলঙ্ঘনীয়। আপনি হয় ত বলিবেন যে, আব্দার এক জিনিষ, আর পদাঘাত এক জিনিষ। কিন্তু মনে রাখিবেন রমণীর পদাঘাত। সেকেলে কবিরা ঠিকই বলিয়াছেন, "পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি"। আমরাও শুষ্ককাষ্ঠ না হইলে এতদিনে ডালপালা গজাইয়া কুসুমিত হইয়া উঠিতাম। যে সঙ্গীতানভিজ্ঞ, তাহাকে শাস্ত্রে পুচ্ছবিষাণহীন পশু বলা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় লাক্ষারাগরঞ্জিত নূপুরালঙ্কারশিঞ্জিত, তালে তালে পৃষ্ঠদেশে পাতিত, রমণীচরণারবিন্দের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে সে ব্যক্তি ততোধিক হেয়। পুরুষের জাতি-বর্ণ-গুণানুসারে মান্যের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু আমার মতে প্রত্যেক সুন্দরী রমণীই শ্রেষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। নারায়ণ ব্রাহ্মণের পদ বক্ষে ধারণ করিলেন, কিন্তু গোপকন্যা রাধিকার চরণ মস্তকে ধরিবার জন্য লালায়িত হইয়া বলিলেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারং'! এই কারণেই আমরা প্রতিবাদ করি না,—করিতে পারিও না।

আমি। তবে আর কি? সুখেই ত আছেন!

এই বলিয়া ভদ্রতার সহিত ঢেঁকির নিকট অন্য রাত্রের মত বিদায় লইয়া উঠিতে প্রস্তুত হইলাম। সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে

আমার পা ধরিয়া সজোরে টানিল, আমি পড়িয়া গেলাম। অমনি বিদ্যুদ্বেগে কি যেন একটা নূতন আলোক আমার মনের ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, হোঁচট্ লাগিয়া পড়িয়া যাওয়ায় জাগ্রত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত যে ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়াছি—সে সমস্তই কাল্পনিক। আমার 'স্বপ্নভ্রমণের ব্যাধি' ছিল। তাহার প্রভাবে যথার্থই শয়নগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়াছি এবং পুস্তকখানিও অভ্যাস মত হস্তে লইয়া আসিয়াছি।

পুরুলিয়া,
১৯শে কার্ত্তিক,—১৩১৫ সাল।

কেশ সমস্যা।

——:*:——

প্রথম যখন যৌবনেতে ক'র্‌লাম পদার্পণ
চুলটা নিয়ে বড় বেশী হ'ল সন্তর্পণ।
অবশ্য সে মাথার চুল, কারণ গোঁফ দাড়ি
উঠ্‌তে তারা করেনিকো বেশী তাড়াতাড়ি।
আর হ'লো এক বিষম চিন্তা—কি প্রকারে চুল
মাথার পরে রাখ্‌বো, কারণ নাইক এতে ভুল
চুলটা রাখা আবশ্যক সবারি একান্ত,
বিজ্ঞানেতে ইহার নাকি হয়েছে সিদ্ধান্ত।
আর তা ছাড়া ইতিহাসেও প্রমাণ আছে ঢের,
চুলের ভিতর শক্তি থাকে, যথা স্যাম্‌সনের।

যদি বল পশ্চিমেতে যারাই পালোয়ান,
(মাঘ মাসেতে গায়ে যারা না দেয় আলোয়ান)
তারাই আরো একেবারে ছোট চুল ছাটে,
তা হ'লে বলি যে তারা ধারেই বেশী কাটে
ভারের চেয়ে, অর্থাৎ তাদের এতই ঘন কেশ,
বাড়্‌তে দিলে একেবারে ভ'রে যেত দেশ।

কিম্বা তাদের চুলের গোড়া এত বেশী পুরু,
বাড়্‌তে দিলে মাথা হ'ত বুরুষের গুরু—
অর্থাৎ কি না একেবারে সজারুর গাত্র
সন্দেহ নাহিক তাতে জেনো তিলমাত্র।

শক্তিশালী নাই যে কিছু চুলের সমান
পুচ্ছাকার কেশ-গুচ্ছ তাহারি প্রমাণ।
বৈদ্যুতিকী শক্তি আর চৌম্বক-প্রবাহ
টিকী দিয়া চলে যেন ধরি পরীবাহ।
ঋষিরাও চুল ও দাড়ি রাখিতেন লম্বা,
তাইতে ছিলেন তাঁদের প্রতি প্রীত জগদম্বা।
নেড়ামাথা হরিদাস দেখ্‌তেও অতি বিশ্রী,
যেমন ধারা ওপাড়ার ওই গদাধর মিশ্রী।
চুলটা রাখা অতএব বিশেষ দরকারী
মানুষের পক্ষে, যেমন ঝোলে তরকারী।
চুলই হ'ল মানুষের মাথার বাহার
ভাতই যথা তাহাদের প্রকৃত আহার।

আর তা ছাড়া চুলের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ
দেহের ও মনের ; যারা একেবারে অন্ধ
তারা ভিন্ন কেউ না ইহা ক'র্‌বে অবিশ্বাস,
সত্য ইহা যথা মোরা টানিগো নিঃশ্বাস।

যদি বল, তবে কেন বুদ্ধি ভরা থাকে
টাকের মধ্যে, মধু যথা মৌমাছির চাকে ?
তা হ'লে বলি যে তাহা শুধুই কূট-বুদ্ধি,
খুঁজে যাহা পরচ্ছিদ্র, পরের অশুদ্ধি।
বিস্মার্ক চাণক্য আর গ্লাড্‌ষ্টোন্ মন্ত্রী,
কূট-নীতি-বিশারদ্ ছিলেন কূট-যন্ত্রী।
ব'লে রাখি কিন্তু পাছে হয় অবিচার
বিদ্যাসাগর, সেকস্‌পিয়ারে জেনো ব্যভিচার।

এখন হ'ল ইহাই কিন্তু সমস্যা প্রধান,
কি প্রকারে চুল রাখা উচিত বিধান।
চুলটা দেখে মানুষের ধরণ ধারণ
প্রায়ই লোকে অনুমান করে, এ কারণ
চুলটা নিয়ে হওয়া চাই বড়ই সতর্ক,
এবম্বিধ মনে মনে করি নানা তর্ক,
দেখ্‌লাম যে বেণী রাখা নহে সমীচীন ;
কারণ তাতে হ'তে হয় নারী কিম্বা চীন ;
কিম্বা বড় ক'রে যদি রেখে দিই জটা,
ভণ্ড ব'লে সবাই হবে আমার পরে চটা।
আর যদি খুব ছোট ক'রে ছেটে ফেলি চুল,
তেড়ীকাটার সখটা হবে সমূলে নির্ম্মূল।

আরো ভেবে দেখ্‌লাম্‌, যদি রাখি এক টিকী,
কলেজিরি ফ্রেণ্ডগুলো হবে টিক্‌টিকী ;
অর্থাৎ সেটা কেটে দেবার ক'রবে তারা চেষ্টা,
টিকী নিয়েই দেশটা ছাড়া হতে হবে শেষটা।
তার চেয়ে কোঁকড়ানো চুল নয়কো কিছু মন্দ,
যে কারণ কেউ না সেটা করে অপছন্দ।
কিন্তু তারো ভারি এক গণ্ডগোল আছে,
আট আনা দক্ষিণা মাসে নরোত্তমের কাছে।
আর যদি চুল সমান করে ছাটি আগাগোড়া,
ব'ল্‌বে সবাই মাথা যেন কদমের তোড়া।
যদি বা সুমুখে চুল রাখি কিছু বড়,
বুড়োরা সব ব'ল্‌বে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়।

এ হেন মুস্কিলে পড়ি উপায় কি করি
ভাবতেছিলাম, এমন সময় বন্ধু ভজহরি
বল্লে "দেখ, বাবরী রাখা বড়ই প্রশস্ত ;
বাবরী রাখ, হবে তুমি কবিবর মস্ত।
বাবরী পরে সরস্বতী হবেন অবতীর্ণ,
গঙ্গা যথা হর-শিরে ঘন জটাকীর্ণ।
কিন্তু তারও চাই আগে প্রচুর সাধনা,
তাইতে হ'ল নাক আর বাণীর আরাধনা।

অগত্যা শেষেতে আমি করিলাম ঠিক,
সম্ভাবনা বুঝে আর ভেবে চারিদিক,
নূতন প্রকারেতে চুল রাখাই বিহিত,
পিছন দিকে বড় আর সামনে বিপরীত।

ভবানীপুর,
৫ই মাঘ,—১৩২১, সাল।

নোলক।

—:০:—

অয়ি নাসাগ্রদোলক মৌক্তিক-বিন্দু! অয়ি বালিকা-যুবতী-বয়োমধ্য-বিহারিণি, অপূর্ব্বলাবণ্যময়ি নোলকেশ্বরি তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। অয়ি নবোঢ়াবদন-কমলোদ্ভাসিনি! তুমি নববধূর সলজ্জকপোল, সুস্মিতাধর, ব্রীড়াবনত মুখখানির উপর যে অতুলনীয় শ্রী ছড়াইয়া দাও, তাহার নিকট তাজমহলের শোভাসম্পদও ম্লান বলিয়া প্রতিভাত হয়। সদ্যোদ্ভিন্ন-যৌবনা ও পূর্ণাবয়বার মধ্যে যে স্বল্প অবকাশটুকু, তাহাই তোমার রাজত্ব কাল; তাহার মধ্যেই তুমি রাজ-রাজেশ্বরীর ন্যায় বিরাজ কর, এবং তাহার অন্তেই তুমি বিলীন হও। চাণক্যের ভাষায় বলিতে গেলে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" তোমাকে আর বড় দেখিতে পাই না। অন্যান্য আভরণ পূর্ব্ববৎ নারী-অঙ্গে বিহার করিতে থাকে বটে, কিন্তু তুমি পত্রাগ্রবিলম্বী লম্বমান শিশির-কণার ন্যায় প্রখর যৌবন-মার্ত্তণ্ডাতপে শুকাইয়া যাও। তুমি নলিনী-দলগতজলবৎ সততই তরল, সততই চঞ্চল, সততই টলটল করিয়া দুলিতেছ; যৌবন-তরঙ্গের উদ্বেল হিল্লোলে তুমি টুপ করিয়া পড়িয়া যাও। আমার ইহাও মনে হয় যে প্রত্যাসন্ন-যৌবন-বসন্তে মুকুলিত দেহলতিকায় তুমি একটী নবোদ্গত শুভ্র কলিকা; পরিণত বসন্তের তাপাধিক্যে তুমি নাসাবৃন্ত হইতে খসিয়া পড়।

তরুণী বালার তুমিই একমাত্র আভরণ। অন্যান্য আভরণ তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে। অন্যান্য আভরণে তাহার ন্যায় যুবতীরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তুমি বালিকার অঙ্গে প্রযুক্ত হইলেও যুবতীর অঙ্গে প্রযুক্ত হওনা। তুমি সম্পূর্ণ বালিকাশ্রয়িণী বা বালিকাত্ব-ব্যাপিনী। তোমার মত বালিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব আভরণ আর একটী মাত্র আছে,—চরণের মঞ্জীর।

কিন্তু মঞ্জীরের কথা ছাড়িয়া দিলে নোলককেই বালিকার একমাত্র আভরণ বলা যাইতে পারে। নোলকেই বালিকার বদন-কমল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোভমান হয়। কেবলমাত্র নোলক নাসাগ্রে দোদুল্যমান থাকিলে বালিকার যে সৌন্দর্য্য বিকসিত হয়, নোলক না থাকিলে তদ্ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কারেও সেরূপ হয় না। আবার ঐ নোলক যদি কোন বিংশতিবর্ষীয়া রমণীর নাসায় দোলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে নাসা তিলফুলের ন্যায়ই হউক আর শ্যেনচঞ্চুর ন্যায়ই হউক, তাহাকে অবিলম্বে শূর্পনখার নাসায় পরিণত করিতে ইচ্ছা হয়। যদি কোন যুবতী পত্নী স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বা বালিকাশ্রী অনুকরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া উক্ত প্রকার অলঙ্কারপারিপাট্যে মনোযোগিনী হন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যশালী স্বামী যে অচিরাৎ অলঙ্কারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু হে নোলক! তুমি যদি তরুণী বালার নাসাগ্রে অবস্থান কর৷ তাহা হইলে তোমার তুল্য অলঙ্কার আর কি আছে? একদিকে বালিকা কেবল তোমাকেই ধারণ করুক, অপরদিকে যুবতী তাঁহার

সমগ্র অলঙ্কারে দেহলতাকে বিভূষিত করুন, দেখা যাক্ কোন্‌টি অধিক সুন্দর, একবুদ্‌বুদ্‌শালিনী স্বচ্ছসলিলা গিরিনির্ঝরিণী অধিক সুন্দর, না ফেণাবর্ত্তসঙ্কুলা পূর্ণাবয়বা স্রোতস্বিনী অধিক সুন্দর ? একতারাসংযুক্ত সান্ধ্যগগন অধিক সুন্দর, না কোটি-তারকা-সমন্বিত নৈশ আকাশ অধিক সুন্দর ? প্রথম যখন প্রদোষকালে পশ্চিমাকাশে সান্ধ্য তারাটির উদয় হয়, প্রথম যখন সেই কোমল তরল নীলিমায় সেই স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র জ্যোতির্ম্ময়ীর আবির্ভাব হয়, যখন সে সৌন্দর্য্যের সহিত আর কিসের তুলনা দিব খুঁজিয়া পাই না, তখন সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হৃদয় কবির ভাষায় বলিতে থাকে—"জ্যোতি-বসনে গোধূলি আসনে বসি আনমনে কারে চাও ?" । কিন্তু সে সৌন্দর্য্য নিমিষেই অপসৃত হয়। দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া বহু তারকায় গগনাঙ্গ খচিত হয়, এবং সে সান্ধ্যতারাটিও দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া যায়। ক্রমে তমস্বিনী রজনীর গাঢ়কৃষ্ণাকাশ অযুতশ্বেতবিন্দুখচিত বিহঙ্গপক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সে শোভাও মনোজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু রজনীর পরিণতাবস্থার সেই শোভা কি তাহার তরুণাবস্থার শোভা দ্বারা পরাভূত হয় না ? যদি ঐ উভয়ই কোন পার্থিব শিল্পী বা চিত্রকরের কার্য্য হইত, তাহা হইলে বলিতাম যে, শেষ—প্রদর্শিত চিত্রে অধিকতর উজ্জ্বলতা পারিপাট্য ও শিল্পনৈপুণ্য আছে বটে, কিন্তু প্রথম প্রদর্শিত চিত্রে উহার কিছু না থাকিলেও, তাহা অধিকতর ভাবোদ্দীপক, অধিকতর হৃদয়গ্রাহী এবং অধিকতর স্বপ্নময়ী-কল্পনা-প্রসূত।

হে নাসিকারঞ্জিনি ! তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অলঙ্কার। অতি নির্ধন

পিতাও কন্যাকে তোমার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক জামাতা হস্তে সমর্পণ করেন। দরিদ্রা পল্লী-বাসিনী বালিকা 'সম্পূর্ণ নিরাভরণা' এই অপবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ তোমাকেই ধারণ করিয়া থাকে। তুমি একটি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু; কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র হইলেও তোমার আসন রমণীদেহের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বপুরোবর্ত্তী স্থানে। তুমি বিন্দু হইলে কি হয়, তোমার বিন্দুর মধ্যে অনেক সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি নিহিত আছে। তারকাও কেবল মাত্র একটি বিন্দু, কিন্তু তারকা না থাকিলে অনন্ত নৈশ নীলাকাশ পানে কে চাহিত? কবি, জ্যোতির্ব্বিদ্, বৈজ্ঞানিক সকলেই ঐ ক্ষুদ্র বিন্দুর প্রেমে মুগ্ধ! সুদীর্ঘ ময়ূরপুচ্ছে বর্ণবিন্দু আছে বলিয়াই তাহা এত সুন্দর, শ্যামল মেঘমালায় বারিবিন্দু আছে বলিয়াই তাহা নিদাঘ-সন্তপ্তের এত নেত্রতৃপ্তিকর, বিভীষিকাময়ী তমস্বিনী রজনীতে খদ্যোত-বিন্দু জ্বলে বলিয়াই তাহা অপূর্ব্ব শোভা-ময়ী। আমি বিন্দুর বড়ই পক্ষপাতী। অরণ্যের মধ্যে যদি কুসুম-বিন্দু না হাসিত সাগরমধ্যে যদি তরঙ্গবিন্দু না জ্বলিত, তবে কি তাহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত না? অতএব হে নাসিকারঞ্জিনি, তুমি বিন্দু হইয়াও বৃহৎ! একটি স্ফুলিঙ্গকণিকা হইয়াও তুমি অনায়াসে একটি সুবৃহৎ হৃদয়রাজ্যকে দগ্ধ করিয়া দিতে পার।

তুমি কোথাও নোলক, কোথাও নাসাফুল, কোথাও বা বেসররূপে পরিচিত। কখন তোমার দেহ স্বর্ণময়, কখন বা রৌপ্যময়, কখন বা মণিময় হইয়া থাকে, কিন্তু মুক্তাই তোমার প্রকৃত রূপ। তুমি

ওষ্ঠাধরের উপর এরূপভাবে দোদুল্যমান হইতে থাক যে, দেখিলে কত সুমধুর কল্পনাই মনোমধ্যে উদিত হয়। মনে হয় তোমাকে ঐরূপ দোলাইয়া দিবার একটি উদ্দেশ্য আছে। কবি তাঁহার কাব্যে সুন্দরী বালিকার অমল ধবল দশনপংক্তির সহিত মুক্তাফলের উপমা দিয়াছেন, কোথাও বা তাহার নিকট মুক্তাফলকেও বিড়ম্বিত করিয়াছেন। যেমন সেই কবিবাক্যের সার্থকতা বর্ণে বর্ণে বুঝাইয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য। যখনই কোন সুন্দরী বালিকা প্রভাতকুসুমের ন্যায় হাস্য করিতে থাকে তখনই তুমি তাহার কুন্দ-দন্তগুলির মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া আমাদিগকে বলিয়া দিতে থাক, দেখ দেখি মুক্তাফল অধিক সুন্দর না দশনগুলি অধিক সুন্দর, দেখ দেখি ঐ দশন-বিচ্ছুরিত জ্যোতির নিকট মুক্তাফলও নিষ্প্রভ হইয়া যায় কি না।"

আবার কখনও মনে হয়, তুমি দুইটি তীর্থযাত্রী প্রিয়ার অধর সঙ্গমে মিলিবার একটি ক্ষুদ্র সুমধুর অন্তরায়; যেন তুমি সেই প্রণয়মুগ্ধ হৃদয় দুইটির মধ্যে একটি আশঙ্কাপূর্ণ বাধা একটি সঙ্কোচ-ভরা লজ্জা, একটি বেদনাময় নিশ্চেষ্টতা!

তুমি সৌন্দর্য্যের খনি, কল্পনার ভাণ্ডার, কবিতার উৎস। এক দিন কোন ভাবমুগ্ধ কবি কোন নৃত্যপরায়ণা নর্ত্তকীর নাসিকায় তোমাকে অগ্রপশ্চাৎ দুলিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে নোলক তুমি সর্ব্বসাধারণকে কুহকিনীর মোহিনী আকর্ষণ হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছ। তুমি বলিয়া দিতেছ যে, রমণী নদীর ন্যায়, কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর, কোথাও বা অগাধসলিলা।

কত সাধুপুরুষের ঐ নদীতে নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। অতএব হে জীবনযাত্রী মানব, তুমি তোমার ধর্ম্ম নৌকাটিকে সাবধানে বাহিয়া যাইয়ো ; আমি তোমাকে মস্তক সঞ্চালন দ্বারা বারবার দুঃসাহসিকের ন্যায় ঐ নদীতে আসিতে বারণ করিতেছি। যেরূপ মহাসাগরে আলোকস্তম্ভ অর্ণবযানকে বিপদ হইতে সতর্ক করিয়া দেয় সেইরূপ কবির চক্ষে তুমিও একদিন মানবজাতিকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে সতর্ক করিয়াছিলে।

আর একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় তুমি কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি নবরত্নের কবিত্ব-স্পর্দ্ধার কারণ হইয়াছিলে। রাজ্ঞী ভানুমতী যখন রাত্রিকালে তাঁহার শয়নকক্ষে নিদ্রিতা ছিলেন, তখন কোন তস্কর আসিয়া তাঁহার অঙ্গস্থিত সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিয় লয়, কেবল নাসাগ্রস্থিত নোলকটাই পরিত্যাগ করিয়া যায়। কি ভাবিয়া তস্কর তোমাকে গ্রহণ করিল না ইহাই তাঁহাদিগের সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। কিরূপে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, যাহাকে একদিন কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ আপনাদিগের কবিতামালায় গ্রথিত করিয়া পরস্পরকে রচনা-সৌন্দর্য্যে পরাস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য যে অপরিমেয় তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ভবানীপুর,
২রা পৌষ,—১৩১৯ সাল।

বাঙ্গালী-চরিত।

—:※:—

(১)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মোরা গৃহকোণে বীর, বক্তা সুধীর
আর অতিশয় পরিপাটি ;
যবে জ্যোছনা মলয় ঘটায় প্রলয়
মোরা প্রেমের জাবর কাটি।
বিপদের নামে থাকি গো অটল,
কাছে এলে আঁখি করে টল্‌টল্‌,
আর স্কন্ধে চাপিলে তুলিগো পটল
ভয়েতে হইয়া মাটি ;
মোরা মচকাই তবু ভাঙ্গিনা কখন
মুখের দাপটে সাঁটি ;
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

(২)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মোরা হয়ে বিনিদ্র, পরের ছিদ্র

সতত লইয়া ঘাঁটি,
শুধু নিজের রন্ধ্র দেখিতে অন্ধ—
নয়নযুগল আঁটি।
ভিখারী গরীব, দীন প্রতিবেশী
সেদিকে আমরা চাহিনাক বেশী
হায়, তথাপি আমরা পূর্ণ স্বদেশী
বাখানি দেশের মাটি ;—
আর স্বদেশের তরে কাঁদি অকাতরে
দেশীভাবে চুল ছাঁটি :
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

(৩)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মোরা কুৎসা কলহ করি অহরহ,
কিছুতে বলিনা 'না' টি ;
আর ভা'য়ে ভা'য়ে ঘরে বিচ্ছেদ তরে
মন্ত্রণা যত আঁটি।
ভালগুলি রেখে মন্দ সকল
নিয়েছেতে মোরা টুকি অবিকল,
তাও মাছিমারা সে সব নকল
তাতেই গর্ব্বে ফাটি ;

তবু নকলনবিস বলে যদি কেহ
মারি তার মাথে চাঁটি :
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

(৪)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মোরা জীবন-তরণী সেই দিকে বাহি
যখন যেদিকে ভাঁটি।
আর চড়ায় বাধিলে চীৎকার করি
মাথায় করিয়া গাঁ—টি।
স্বার্থ-নীতিই মোদের কেতাব,
চাই মোরা শুধু লম্বা খেতাব,
রায় বাহাদুর, রাজা, মহাতাব,
নবাব খাঞ্জা খাঁ—টি,
মোরা সকল বিষয়ে পণ্ডিত সাজি
সাধা আছে মুখে "হাঁটি" ;
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

(৫)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মজলিস্ ক্লাবে টানি মোরা সবে
কাফি, বিস্কুট, খাঁটি,

আর নিজের লজ্জা নিন্দা যা কিছু
দশের মধ্যে বাঁটি।
মোরা অপমান-ক্ষতে ত্বরায় মালিস
মাথাইয়া, পরি হাসির পালিশ,
আর কোলেতে টানিয়া তাকিয়া বালিস
ঘুরাই পাথার ডাঁটি ;
মোরা নব্যধরণে সভ্যচরণে
নূতন পথেতে হাঁটি :
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

আরসি।

—*—

আরসি চক্ষের অসম্পূর্ণতানাশক। চক্ষু যাহা দেখিতে না পায় আরসি তাহাই দেখাইয়া দেয়। চক্ষুর দ্বারা আপনি চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দ্রব্যই দেখিতে পান, আপনার দেহেরও অনেকাংশ দেখিতে পান, কিন্তু দেখিতে পাননা কেবল আপনার মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশ। একখানি আরসি সম্মুখে রাখিলে আপনার মুখমণ্ডল ও অপর একখানি পশ্চাতে রাখিলে আপনার পৃষ্ঠদেশ আপনার চক্ষে পতিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনে হইতে পারে যে এরূপ গুরুগম্ভীর ভাবে এই সামান্য সত্যটিকে প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু আরসির সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে যে মানবহৃদয়ের রহস্য নিহিত আছে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আরসির সৃষ্টি কি জন্য? বর্ত্তমান যুগে আরসির দ্বারা অনেক জটিল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে সত্য এবং সুদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রকার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আরসি প্রথম কি কারণ সৃষ্ট হইয়াছিলন?

সে কারণ আর কিছুই নয় কেবল মুখ দেখিবার ইচ্ছা। যাহা নিতান্ত আমারই, তাহা অপরে দেখিতে পাইবে অথচ আমি দেখিতে পাইব না—এই নিদারুণ অভাব আদিম যুগ হইতে মনুষ্য চিত্তকে

ব্যথিত করিয়া আসিতেছিল সন্দেহ নাই। আমি অপরের নিকট আমার মুখ দেখাইয়া পরিচিত, অথচ আমি প্রকৃতপক্ষে আমাকে চিনি না—ইহা কি অল্প আক্ষেপের কথা? আমি দেখিতে কিরূপ, তাহা আমার জানিবার অধিকার নাই—ইহা কি কোন উৎকট পাপের শাস্তি, না বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটি উদ্ভট রহস্যমাত্র?

আমি সুন্দরী রমণী—আমার সৌন্দর্য্যে লোকে আকৃষ্ট হয়, আত্ম-বিক্রীত হয়। আমার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া কাহারও শান্ত মস্তিষ্কে মাদকতার সঞ্চার হয়, কাহারও কঠিনতম বক্ষঃপ্রদেশে বিনামূল্যে আমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। অযাচিত স্তুতিবাদে কেহ আমার কর্ণকূহর পরিতৃপ্ত করেন, কেহ আমার উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়াও আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন;—কেহ বা আমার সামান্য সুখের জন্য জীবনোৎসর্গ করেন, আবার কেহ বা বিভীষিকাময় বিপ্লবের অবতারণা করেন। আমি কাহারও উৎকট উপমার স্থল, কাহারও প্রচণ্ড মধুর সম্বোধনের পাত্র, কাহারও সাধনার ধন, কাহারও চিন্তার একমাত্র বিষয়, কাহারও বা আজীবনের আরাধ্য দেবতা। কেন, আমি কি গুণে এত শীঘ্র এত অনায়াসে সকলের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিলাম? সে কেবল আমার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, আমার কমনীয় মুখশ্রী।

এখন বলুন দেখি—আমার কি আমার নিজের মুখখানি দেখিবার ইচ্ছা হয় না? এ ইচ্ছা কত নৈতিক তাহা জানি না কিন্তু স্বভাব-প্রণোদিত। মানবহৃদয়ে যে অহমিকা ও আত্মপ্রসাদের বীজ

লুক্কায়িত আছে, তাহার অচিন্তনীয় শক্তি-প্রভাবেই আমি মাঝে মাঝে আমার মুখখানি দেখিবার জন্য এত লালায়িত হই। শুধু আমি কেন, জগতের আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিই ঐরূপ হইয়া আসিতেছেন। যিনি নিতান্ত কুৎসিত, তিনিও আপনাকে দর্পণোদরে দেখিতে ভালবাসেন এবং বোধ হয় অনেকটা সুন্দরও দেখেন; কারণ তাঁহার মনে এমন একটা সৌন্দর্য্যাভিমান আছে যাহাতে তিনি বরং আপনাকে মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করিবেন তথাপি কুৎসিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। তিনি জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়াও, তাহার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যেখানে আত্মপ্রবঞ্চনায় সুখ আছে, সেখানে কয়জন আপনাকে না প্রবঞ্চিত করে? কয়জন আপনার বিচারে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে?

অতএব ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমি বিদ্যাদিগ্‌গজের ন্যায় কুৎসিত পুরুষ হইলেও আমার একখানি দর্পণের প্রয়োজন। আয়েসার ন্যায় অনিন্দ্য সুন্দরীর দর্পণে মুখ দেখিবার যে অধিকার আছে ও তৎপক্ষে যে অলঙ্ঘনীয় যুক্তি আছে আমারও ঠিক তাহাই আছে।

সুতরাং আরসি সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে মনুষ্যজাতি ঐরূপ কোন পদার্থের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং যখন উহা উদ্ভাবিত হইল তখন তৎকালীন জনসমাজ যে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বোধ হয় তাঁহাদের পরবর্ত্তন বংশধরেরা ষ্টিম্‌এঞ্জিন-বা এয়ারোপ্লেনের উদ্ভাবনেও

ততোধিক আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। যাই হউক আরসি সৃষ্ট হইবার পরই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, উহা দ্বারা যে কেবল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করা যায় এমত নহে, পরন্তু উহার সাহায্যে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে মুখের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন বা আধুনিক রমণীরা যাহাকে প্রসাধন কার্য্য বলেন তাহাও উত্তমরূপে চলিতে পারে। কোথায় কোন্ অলকরেখা একটু কুঞ্চিত করিয়া দিলে ভাল হয়, কোথায় সীমন্ত আর একটু সরলভাবে বিষুবরেখার ন্যায় মস্তক-গোলার্দ্ধের উপর দিয়া টানিয়া দিলে অধিক নয়নরঞ্জন হয়, কোথায় অধরপ্রান্তে তাম্বুলরাগ একটু পরিম্লান হইল, কোথায় কর্ণাভরণটি একটু হেলিয়া পড়িল ইত্যাদি সামান্য সামান্য গুরুতর বিষয়গুলির নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে এরূপ সুবিধাজনক ও অভ্রান্ত সহায় আর কিছুই নাই। অর্ণবযানে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র না থাকিলে নাবিকেরা যেরূপ প্রমাদ গণিয়া থাকেন, এই মুখদর্শন-যন্ত্র গৃহে না থাকিলে বামাকুলও সেইরূপ প্রমাদ গণিয়া থাকেন। তখন ব্যবস্থাহীন গৃহ যে কর্ণধার-বিহীন জাহাজের ন্যায় কোন্ দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ছুটিবে তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না।

নারীগণ চিরদিনই দৈহিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতিনী, কারণ পুরুষের চিত্তাপহরণের উপরই তাঁহাদিগের বলবিক্রম, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করে। কমলাকান্ত অপর কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তাই স্ত্রীজাতিই সর্ব্বদা সৌন্দর্য্য সাধনে ব্যস্ত। আমার বোধ হয় মানসিক চর্চ্চায় তাঁহাদিগকে কিছু

কম লিপ্ত থাকিতে হয় বলিয়াই তাঁহারা কার্য্যান্তরাভাবে বা অভাব-পূরণ-কল্পে দৈহিক উৎকর্ষসাধনে অধিক মনোযোগিনী। কিন্তু কারণ যাহাই হউক আরসির ন্যায় বন্ধু তাঁহাদের আর কেহই নাই। রমণীগণের বৈকালিক প্রসাধন ব্যাপার যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে গৃহে গৃহে চলিয়া আসিতেছে, যাহাতে বামাকুল অতীব সময়নিষ্ঠ এবং কদাচিৎ ভ্রমপরায়ণ, যাহা সুসম্পন্ন না হইলে তাঁহাদিগের মানসিক অবস্থা সকল প্রকার গার্হস্থ্য বিষয়েরই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং সে দিবসের ন্যায় মুখমণ্ডল হইতে শান্তভাব নির্ব্বাসিত হয়, যাহার যৎকিঞ্চিৎ বিঘ্নোৎপাদন জন্য প্রাণাধিক-প্রিয় শিশু-সন্তানও চপেটাঘাত দ্বারা পুরস্কৃত হয় এবং যাহার অভাবে নিমন্ত্রণ গমন বা দূরদেশে যাত্রা পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যায়, সে ব্যাপার আরসি ব্যতীত কি কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত?

মুক্তাবিনিন্দিত দশনপংক্তিতে কেশবিন্যাস রজ্জু দংশন করিয়া যখন কোন সুন্দরী অধোবদনে দর্পণের সম্মুখে অবস্থান করেন, তখন যথার্থই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় 'মুকুরে বদন দেখো না ধনি'। বাস্তবিক আপন প্রিয়তমাকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিলে পুরুষমাত্রেরই আশঙ্কা হইতে পারে যে, পাছে নিজের অনিন্দ্য-সুন্দর সুকোমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের গুম্ফ-বিজড়িত অপ্রিয়-দর্শন মুখখানির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এরূপ আশঙ্কা যদি নিতান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, মুকুরে মুখ দেখিয়া অনেক অনর্থ ঘটিয়াছে। স্বামীর অনাদরে অভিমানিনী পত্নী হয়ত

দুই চারি বার মুকুরে মুখ দেখিলেন। মুকুরের চাটুকারিতায় ও সখীর অযাচিত সমবেদনা-প্রকাশে তিনি অতি শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে তাঁহার অলোক-সামান্য রূপরাশিকে অবহেলা করা নিতান্ত হৃদয়হীনতার কার্য্য। আর কেহ যদি সে সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইত তাহা হইলে সে আপনাকে বিপুল সৌভাগ্যবান্ মনে করিত। আর একবার মুকুরে মুখ দেখিয়া অভিমান দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, মনে হইল "দেখি আমার সৌন্দর্য্যের এতটুকু আকর্ষণ আছে কিনা যাহাতে আমার অনুতপ্ত স্বামীকে অচিরেই পদতলে লুণ্ঠিত করিতে পারি।" হয়ত তাঁহার অদূরদর্শী পতি তাঁহার মানসিক সংকল্পের গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শীঘ্র অনুশোচনার কোনই চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। আপনার সৌন্দর্য্যাভিমানে নির্ম্মম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন-হৃদয়া পত্নী হয়ত একদিন তাঁহার বিফল সৌন্দর্য্যকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া স্বামীর নয়নপথ হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে বিষপান করিলেন। হে মুকুর! তুমি কি ভয়ঙ্কর অনর্থই ঘটাইলে? তুমি না থাকিলে হয়ত তিনি রাগিয়া পিত্রালয়েই গমন করিতেন, অথবা একমাস কাল বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াই থাকিতেন, কিন্তু ওরূপ চরমসীমায় তিনি আরোহণ করিলেন ত কেবল তোমারই জন্য। আবার মনে করুন হয়ত কোন বিবাহার্থিনী ইংরাজমহিলা কোন সঙ্গতিপন্ন সুপুরুষ যুবকের নেত্র-কৌমুদী হইয়াছেন। যুবকের অনুরক্তির মাত্রা ক্রমশই বাড়াইবার জন্য যুবতী আপনার মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহ্যিক তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেছেন ও প্রত্যহ

বেশবিন্যাস কালে দর্পণে আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তিনি আরও কিছুদিন নিরাপদে যুবকের সহিত উক্তরূপ নিষ্ঠুর ক্রীড়া করিতে পারিবেন। একদিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অনুরাগ-লক্ষণ উপভোগ করিবার বাসনা, অপরদিকে পাছে তাঁহার কৃত্রিম তাচ্ছল্যে বিরক্ত হইয়া যুবক সহসা অন্য মহিলাতে মনোনিবেশ করেন এই আশঙ্কা। এই দুই বীপরিত ভাবের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তিনি প্রত্যহই যুবকের প্রতি প্রযুক্ত আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়কে মানসিক তুলাদণ্ডে তৌল করিতে লাগিলেন।

অথবা যেমন কোন সুনিপুণ মৎস্যশিকারী আপনার ছিপের সূতাটি মধ্যে মধ্যে টানিয়া দেখে ও তদ্দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করে, ঠিক তদনুরূপ ভাবে গ্রথিত মৎস্যকে খেলাইয়া থাকে, আমাদের নায়িকাও সেইরূপ দর্পণ-পরীক্ষায় আপনার সৌন্দর্য্য-রজ্জুকে যেরূপ দৃঢ় বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ভাবে তাঁহার প্রণয়ীর সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলেও তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে সে রজ্জু ছিন্ন হইবার সত্বর কোনই আশঙ্কা নাই, কিন্তু ফলে বিপরীত ঘটিল। যুবক যুবতীর ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া সহসা আপনার আনুগত্য পরিবর্ত্তন করিলেন। যুবতী নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হইলেন কিন্তু এক্ষণ তিনি নিরুপায়। মুকুরে মুখ না দেখিলে কি তিনি এরূপ করায়ত্ত শিকারে বঞ্চিত হইতেন?

কিন্তু যতই অনর্থ ঘটুক, রমণী কখনো দর্পণে মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা একটি ধ্রুব সত্য। অর্থই যাহার একমাত্র

শক্তি সে যেরূপ বারবার আপনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে সেই অর্থ দেখিয়া সুখানুভব করে, সেইরূপ রমণীগণও বার বার আপনাদিগের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সুখানুভব করেন। সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসও উহার অন্যতম কারণ। আমার মনে হয় যে, বিবাহকালে কন্যার হস্তে দর্পণ দিবার যে পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাও ইহার অভিব্যক্তি মাত্র। নারী বিবাহ-রজনীতে স্বামীর চিত্তাকর্ষণ করিতে চান, কারণ ইহা একটি মনোবিজ্ঞানের সত্য যে, মনুষ্যের হৃদয়ে প্রথম যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা শীঘ্র অপনীত হয় না। সুতরাং বিবাহ-রজনীতে কন্যা যে বারবার দর্পণে মুখ দেখিবেন ও তজ্জন্য একখানি দর্পণ হাতে রাখিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত আমরা দর্পণে মুখ দেখিবার প্রত্যক্ষ দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিয়াছি, কিন্তু দর্পণ হস্তে রাখিবার প্রথাটি এখনও প্রাচীন উদ্দেশ্যের নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যাহা হউক, হে দর্পণ! তুমি ধন্য! তুমি প্রত্যহ কোটি কোটি সুন্দরী রমণীর মুখারবিন্দ বক্ষে ধারণ করিতেছ। তাঁহারা তোমাকে কত না যত্নে কত না সন্তর্পণে ব্যবহার করেন, সুকোমল করপদ্মে তোমার অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া দেন, তোমার অভাবে কতই না কাতর হন। তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?

আরসি সৃষ্টির মূলে কি অভাব-জ্ঞান নিহিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, এখন তাহার ক্রমোদ্ভব সম্বন্ধে যে কল্পনাটি স্বতই মনো-মধ্যে উদিত হয়, তাহাই বর্ণনা করিব।

সম্ভবতঃ এই সমগ্র মানবজাতির জননী প্রথম যেদিন তৃষ্ণা নিবারণার্থ কোন সরোবরতীরে উপনীত হইলেন, সেদিন সহসা সেই স্বচ্ছ সরোবর-নীরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমকিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার মুখমণ্ডল কখন দেখেন নাই বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে, সলিলমধ্যস্থ মূর্ত্তি কাহার। তিনি একটু ভীতা হইয়া নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, সরোবরস্থ মূর্ত্তি তাঁহাকে কোন প্রকার হিংসা করিবার উদ্যোগ বা শব্দোচ্চারণ করিল না। তাঁহার ভয় প্রথমে বিস্ময় ও পরে কৌতূহলে পরিণত হইল। তিনি কত প্রকার কল্পনাই করিতে লাগিলেন ; ভাবিলেন বুঝি ইনি জলদেবী হইবেন, দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন। তিনি জলদেবীকে সম্বোধন করিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু জলদেবী কথা কহিবার মত মুখভঙ্গী করিলেও তাঁহার কোন প্রকার বাক্য কর্ণগোচর হইল না। জলদেবীর এই প্রকার অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি আরও অভিনিবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেই তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, জলদেবীর অবয়বের সহিত তাঁহার অবয়বের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে, এমন কি তাঁহার কণ্ঠে, কর্ণে ও বাহুমূলে যে অলঙ্কার আছে, তাহা পুষ্পেরই হউক বা নর-কঙ্কালেরই হউক (কারণ এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে) তাহাও জলদেবীর অঙ্গে বিদ্যমান। তিনি আরও

আশ্চর্য্য হইয়া সহসা অন্যমনস্ক ভাবে হস্তোত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, জলমধ্যস্থ মূর্ত্তিও ঠিক তাহাই করিল। তখন তিনি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জলদেবীর সম্মুখে ধারণ করিলেন, জলদেবীও মুষ্টিবদ্ধ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত করিল; তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া মুখবিকৃতি করিলেন, জলদেবীও তাহাই করিল। তিনি হস্ত দ্বারা জলে আঘাত করিলেন, জলদেবীর দেহ ভগ্নপ্রায় হইয়া তরঙ্গ মধ্যে লুক্কায়িত হইল। জল পুনর্ব্বার শান্তভাব ধারণ করিলে জলদেবীর মূর্ত্তি পুনঃ প্রকটিত হইল। স্বাভাবিক ব্যঙ্গপরায়ণতাই জলদেবীর এই বিচিত্র অনুকরণের কারণ স্থির করিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন, জলদেবীও তাহাই করিতে লাগিল। তখন হয়ত তাঁহার মনে হইল যে, ইতিপূর্ব্বে বনদেবীও তাঁহার সহিত ঐরূপ কুৎসিৎ ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে যে কথা কহিয়াছিলেন, বনদেবীও ঠিক সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সেই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, হয়ত এই সকল দেবীগণের স্বভাবই এইরূপ। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি জলপানের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সহসা প্রকৃতি-প্রেরণায় তাহা পুনর্ব্বার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে তিনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় জলে নামিতে সাহসী না হইয়া গণ্ডূষ দ্বারা জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জলদেবীও তাঁহারই মত জলপানোদ্যত হইল। তৃষ্ণা না পাইলে কেবল ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে কে কবে জল পান করিয়া থাকে? আর জলাশয়স্থ মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল তাঁহারই মত, ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে? কই, তিনিত আরও দুই একজন মনুষ্য দেখিয়াছেন,

তাহারা কেহইত তাঁহার মত নয়। এইবার সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে সত্যের আলোক অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইল। তিনি এক ঘণ্টাকালব্যাপী চিন্তার পর বুঝিতে পারিলেন যে তিনিও যাহা, জলাশয়স্থ মূর্ত্তিও তাহাই; তাঁহাতে ও উহাতে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তিনি এক হইয়াও সহসা দুই হইলেন কিরূপে ইহাও এক দারুণ সমস্যার বিষয় হইল। ক্রমে আরও কিছুকাল চিন্তার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহার জীবন নাই, উহা কেবল তাঁহারই শরীরের ছায়া বা প্রতিবিম্ব। এইবার তিনি নির্ভয়ে প্রফুল্লচিত্তে জল পান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হায়, যদি আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরই এই দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, তবে আর ভাস্বরক সিংহের অপরাধ কি?

যাহা হউক, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জলে দেহ প্রতিবিম্বিত হয়, তখন আপনার মুখসৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি জলাশয় তীরে দৌড়িয়া যাইতেন ও অনিমেষলোচনে আপনার সৌন্দর্য্যদর্শনে সুখানুভব করিতেন। কিন্তু দিবসে কতবার জলাশয়তীরে দৌড়িয়া যাওয়া যায়? তদ্ব্যতীত জলাশয়ের জল কখনও কর্দ্দমাক্ত কখনও শৈবালযুক্ত, কখনও বা তরঙ্গায়িত হয়, কখন তাহা হইতে বাষ্প উঠে, কখনও তাহা শুকাইয়া যায়। সুতরাং এই অসুবিধা দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, যখন তিনি একদিন তাঁহার মৃণ্ময় পাত্রটি জলে পরিপূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন সহসা কলসের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মধ্যেও আপনার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন।

তদবধি বোধ হয় তিনি গৃহাভ্যন্তরে একটি পাত্র সর্ব্বদা জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতেন এবং প্রয়োজন হইলেই তাহাতে মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেন। ক্রমে এই সত্য তাঁহার দ্বারা তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল অথবা তাঁহারাও কেহ কেহ স্বকীয় ক্ষমতায় ঐ সত্য আবিষ্কার করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধরদিগের মধ্যে কেহ একদিন ধাতুপদার্থ আবিষ্কার করিয়া দেখিলেন যে, তাহাকে মার্জ্জিত করিলে তাহাতেও প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। আরো বহুশতাব্দী পরে যখন মনুষ্যজাতি কাচ নির্ম্মাণ করিতে শিখিল, তখন তাহারা দেখিল যে, উহাতে আরো উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে। ক্রমে আরো বহুবর্ষ পরে কাচের পৃষ্ঠদেশে পারদসংযুক্ত করিয়া দেখা গেল যে, তাহাতে যেরূপ সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ে সেরূপ প্রতিবিম্ব আর কিছুতেই পড়ে না। এইরূপে এক যুগযুগান্তব্যাপী চেষ্টার ফলে আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান উন্নতির স্তরে উপনীত হইয়াছি।

কিন্তু যদি মানব আপনার মুখমণ্ডল আপনি দর্শন করিতে পারিত তাহা হইলে আরসির কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি বুঝিতে পারি না কি হেতু ভগবান্ আমাদিগের হস্তের উপরিভাগে মণিবন্ধের নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে একটি চক্ষু প্রদান করেন নাই। তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেই হস্তখানি ইতস্তত ঘুরাইয়া দেহের সকল অংশই দেখিতে পারিতাম। তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বসংগ্রামে দণ্ডায়মান হওয়া সুকরতর হইত এবং বোধ হয় বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যাও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। আমা-

দিগের পশ্চাদ্ভাগস্থ বিপদগুলির বিষয় যথা সময়ে অবগত হইতে পারিলে আমরা অনেকেই অনেক আকস্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতাম। কথামালার এক চক্ষু হরিণের একটি চক্ষু কম ছিল বলিয়াই সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

জগদীশ্বর আমাদিগকে যে একটি তৃতীয় চক্ষু হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, অথবা সকল ত্বকেই দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন নাই, তাহার নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। তবে ইহা নিশ্চয় যে মানব আপনার বুদ্ধিকৌশলে স্রষ্টার উদ্দেশ্য অনেকটা বিফল করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আরসির দ্বারা জগতের আর কোন উপকার হউক বা না হউক, উহা ডারউইন সাহেবের মতটিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে। তাহার সম্মুখে যদি কেহ কিছুক্ষণ নির্জ্জনে দণ্ডায়মান থাকেন, তাহা হইলে তিনি রমণীই হউন, পুরুষই হউন, বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, তাঁহাকে নানাপ্রকার বিকৃত মুখভঙ্গী করিতেই হইবে। পশুশালায় একদা একটি মর্কটের সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সেও ঠিক ঐরূপ করিয়াছিল।

কিন্তু হে আরসি! তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি অনুযোগ এই যে, তুমি আমাদিগের বন্ধু হইয়াও আমাদিগের সহিত কিছু প্রতারণা করিয়া থাক। আমার যে মূর্ত্তি আমি তোমাতে প্রতি-বিম্বিত দেখি, তাহা অনেকাংশে আমার হইলেও সম্পূর্ণরূপে আমার

নয়; কারণ তাহাতে আমার বামভাগ দক্ষিণ ও দক্ষিণভাগ বামরূপে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। আলোক-বিজ্ঞান-বিদেরা যাহাই বলুন, আমার বোধ হয় ইহার কারণ কেবল এই যে, তুমি মনুষ্যের সৃষ্ট। সুতরাং মনুষ্য যখন ভ্রান্তিশীল তখন তুমি সম্পূর্ণরূপে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইলে ন্যায়শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত না। ন্যায়শাস্ত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে, কারণে যাহা নাই কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না, অথবা ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে, "অবস্তু হইতে বস্তুসিদ্ধি অসম্ভব"। তুমি এত বড় কেহ হও নাই যে, আমাদের সনাতন ঋষিসম্মত ন্যায়শাস্ত্রটাকে উল্টাইয়া দিবে।

তুমি মসৃণ ও সমতল; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে তাহাতেই তোমার সৌন্দর্য্য। যে ব্যক্তি তোমার দেহ অসমান করিয়া নির্ম্মাণ করে, সে তোমাকে বড়ই কুৎসিত করিয়া দেয়। তোমাকে কুৎসিত করিয়া গঠিত করিলে তুমিও তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়া থাক। তখন যে ব্যক্তিই তোমাতে মুখ দেখুক না কেন, তাহাকেই তুমি বীভৎস ভাবে বিকৃত করিয়া দাও। দিবেই বা না কেন? মনুষ্য যদি তোমাকে কুৎসিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তুমিও যে মনুষ্যকে কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে তাহা ত ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু তুমি বড়ই চপল-প্রকৃতি। তুমি যখন যাহার তখন তাহার। এই তুমি কাহারও মূর্ত্তি বক্ষঃস্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করিয়া লইলে, মনে হইল সে চিত্র কখনও তোমার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তুমি তাহা অবলীলাক্রমে মুছিয়া,

ফেলিয়া অপর একজনের চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিলে। কি অন্তরে, কি বাহিরে তোমার উপর কেহ কোন চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না—এই তোমার একমাত্র দোষ। নতুবা তোমাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি।

ভবানীপুর,
২৭শে পৌষ,—১৩১৯ সাল।

কাল ও সাদা।

——:*:——

পণ্ডিতে কহিলাম, "বল দেখি দাদা
কাল চেয়ে কেন ভাল সাদা,
কেন সবে সাদা করি পছন্দ
কাল রংটাকি এতই মন্দ ?
লৌহটা কাল কাজেই সস্তা
কাজেই তার চেয়ে দামী দস্তা
সবচেয়ে দামী রৌপ্য ও স্বর্ণ
যেহেতু তাদের উজ্জ্বল বর্ণ।
দেবেরা সাদা দৈত্যেরা কাল
নরকেতে আঁধার স্বর্গেতে আলো
অবিবাহ যোগ্যা বালিকা কৃষ্ণা
কালতে কেন বল এতই বিতৃষ্ণা ?
কি হেতু কাল এত অভিশপ্ত
ভাবিতে যাহে মস্তক তপ্ত ?"
পণ্ডিত কহিলেন, "পড়ে দেখ বেদ
সাদা ও সুন্দরে নাহি কোন ভেদ"।
পণ্ডিত-বাক্য করি শিরোধার্য্য
যেহেতু বোঝা নহে মোর কার্য্য

সোজা ব্যাখ্যা পাইবার আশে
গেলাম বৈজ্ঞানিকের পাশে ;
কহিলেন তিনি "ভেবে দেখ তাই
কাল, যার কোন বর্ণই নাই,
সববর্ণে মিলি সাদাটি সৃষ্ট
সাদা চেয়ে তাই কাল নিকৃষ্ট"।
এ ব্যাখাতে হ'তে সন্তুষ্ট
চাহি বিদ্যা বড় পরিপুষ্ট
সুতরাং প্রশ্নটা করিলাম শেষে
মনোবৈজ্ঞানিকে, তিনি কিছু হেসে
কহিলেন, "আঁধারে দুঃখ ও ভয়
আনে চিত্তে নিঃসংশয়,
শুভ্রালোকে দেয় চিত্তে শান্তি
একারণ ভাল সাদার কান্তি।"
সোজা কিঞ্চিৎ যদিও এ উক্তি
তবুও না ভাল লাগিল যুক্তি।
এহেন কালে তার্কিক আসি
কহিলেন, "আমরা বেশী ভালবাসি
'কাল'কে, যে কারণ আমাদের কালি
কাল, যে কারণ দেবী কালী
দিয়াছেন পা তুলি শিবের বক্ষে
বুঝাইতে ইহা লোকসমক্ষে

'সাদা' নহে কভু 'কাল'র তুল্য
'কাল'র নিয়েতে 'সাদা'র মূল্য"।
কহিলেন বন্ধু, "ও কথা বাজে
সাদারি বেশী মান রাজ্যে সমাজে"।
বন্ধুরি কথা মনে মানিয়া সত্য
কবিবরে জিজ্ঞাসি কারণ-তত্ত্ব ;
কবি কহিলেন অতি গম্ভীরভাবে
ঊর্দ্ধেতে চাহিয়া দিব্যপ্রভাবে
" 'কাল'তে মনে আসে মাটি ও পঙ্ক
মনে আসে চাঁদের ঘোর কলঙ্ক
'সাদা'তে মনে আসে পুষ্প ও দুগ্ধ
একারণ মোরা সাদাতে মুগ্ধ।"
না হ'তে তাঁহার উত্তর শেষ
উন্নতনাশা কুঞ্চিতকেশ
কে এক ব্যক্তি বিদ্রূপ চক্ষে
কহিলেন নানা বাক্য বিপক্ষে ;
কহিলেন, "যদ্যপি মাটি ও পঙ্ক
মনে আসে 'কাল'তে আর কলঙ্ক,
নিশ্চিত মনে আসে 'কাল' নামে
নীলা কস্তুরী কাল জামে"।
তৎপরে আমি ভাবিনু নিজে
এহেন মতভেদ-কারণ কি যে

থাকিতে পারে, অথবা কি জন্য
আমারি মতামত হইবে নগণ্য
যদ্যপি আমি বুদ্ধিতে অল্প
লিখে থাকি কেবলি ছোট গল্প।
মোর মতে তবে হউক ধার্য্য
সাদার শ্রেষ্ঠতা নহেক নিবার্য্য
যেহেতু পুড়িলে দ্রব্যের বর্ণ
হ'য়ে যায় কাল, কাষ্ঠ কি পর্ণ;
এবং পুড়লে যে দ্রব্যটি নষ্ট
হয় তা আমাদের অতিশয় কষ্ট
অতএব মোরা সাদারি পক্ষে
মুখে যদি না বলি বলি তা বক্ষে।

নাপিত।

—:*:—

হে নরশ্রেষ্ঠ নরসুন্দর! তুমি সমাজের একটি জটিল সমস্যা। মাসিক পত্রে প্রকাশিত বহু সমস্যার সমাধান করিয়াছি, অনেক উদ্ভট কবিতার পাদপূরণ করিয়াছি, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্যাতত্ত্ব অধ্যয়ন দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছি, এমন কি দিবসত্রয়ব্যাপিনী চিন্তার পর বার্ণার্ড সাহেবের স্নেলের অঙ্কেরও সমাধান করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে সমাধান করিতে পারিলাম না। যাত্রাকালে তোমাকে দর্শন করিলে নাকি সকল কার্য্য পণ্ড হয়, প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করিলে নাকি সে দিবস আহার নামক নিত্যকৃত্যেরও বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত অশুভ-দর্শন হইয়াও আমাদের সকল শুভ কার্য্যেই তোমার একান্ত প্রয়োজন। তোমার দৃষ্টি অশুভ, কিন্তু তুমি না হইলে হিন্দুর পরম পবিত্র বিবাহে শুভদৃষ্টি করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই। কন্যার পিতা পড়িয়া রহিলেন, সমাগত ভদ্রমণ্ডলী পড়িয়া রহিলেন, এমন কি ধর্ম্মযাজক পুরোহিতও পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইলে কি না—তুমি। তোমাকে বুঝিব কি করিয়া? ব্যবসার হিসাবে তোমাকে অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান বরং চর্ম্মকারবৃত্তি অবলম্বন করেন, তথাপি ক্ষৌরকারবৃত্তি অবলম্বন করেন না; অনেকে বিদ্রূপস্থলে অপরকে 'নাপিত' বলিয়া

সম্বোধন করেন,—কিন্তু জাতিমর্য্যাদায় তোমার স্থান অনেক উচ্চ। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও তোমার স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ করিলে পতিত বা কলুষিত হন না, অথচ সুবর্ণবণিকের জল গ্রহণ করিলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। এই সকল পরস্পর-বিরোধি ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলে যথার্থই তোমাকে একটি নরাকৃতি বিরাট্ সমস্যা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার কারণ কি? পণ্ডিতকুল আমার অপরাধ লইবেন না—কিন্তু আমার মনে হয় যে, পূর্ব্বকালে একদিন কোন নাপিত-কুলতিলক কোন মহামান্য প্রচণ্ডতেজা ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকার্য্যে অবহেলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিংবা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তাঁহার গণ্ডে রুধির-প্রবাহের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই প্রচণ্ডতেজা ব্রাহ্মণ ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া, তাঁহার আর মুখদর্শন করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, এবং নাপিতের মুখদর্শনই যে অমঙ্গলজনক ইহাও সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করেন। নাপিতপ্রবর ইহাতে কিঞ্চিৎ অসুবিধাগ্রস্ত হইলেন সত্য, কিন্তু কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে আপনার সুবর্দ্ধিত কেশপুঞ্জ ও কণ্ডূয়নশীল শ্মশ্রুরাজির সংস্কারের জন্য, তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইল। চতুর নরসুন্দর এইবার সুযোগ বুঝিয়া স্বজাতির সুবিধা-জনক কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন, এবং এই নিমিত্তই বোধ হয় হিন্দুর সর্ব্ববিধ শুভাশুভ-কার্য্যে নাপিতের উপস্থিতি অপরিহার্য্য।

যাহাহউক, হে নরসুন্দর, তুমি অশেষগুণসম্পন্ন; সকল দেশে

সকল জাতির মধ্যেই তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত। তোমার অস্ত্রটিও তোমার বুদ্ধির আদর্শে নির্ম্মিত, অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার। ধারের তুলনায় ক্ষুরের ভার নাই বলিলেই হয়। তোমার বুদ্ধিও অতিশয় তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিকের গভীর পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রকারের প্রগাঢ় অনুশীলন নাই। তাহা সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাযুক্ত, কিন্তু বজ্রের ন্যায় গুরুভার নয়। তোমার বুদ্ধি ও দেহ উভয়ই ক্ষুরের ন্যায় লঘু ও ক্ষিপ্র। ব্যঙ্গকৌতুকে যে তোমরা স্বভাবতই পারদর্শী, রসিক-চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তোমার ক্ষুরখানি মনুষ্য-ত্বকের উপরিভাগে সাধারণতঃ বিচরণ করিলেও, অতি অনায়াসেই মনুষ্য-ত্বকের নিম্নতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; তোমরাও সেইরূপ মনুষ্যসমাজের উপর উপর ভাসিয়া বেড়াইলেও, আবশ্যক মত মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পার।

তোমার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণধার হইল কিসে? ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা প্রস্তরে ঘর্ষিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তোমার তীক্ষ্ণতাও প্রচুর মনুষ্য-সংঘর্ষের ফল। তোমাকে সকল প্রকার মনুষ্যচরিত্রের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে হয় ও সকল প্রকার ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। প্রতিদিন বহুবিধ মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াই বুঝি তোমার বুদ্ধি এত প্রখর হইয়াছে।

দ্বিজাতির উপনয়ন কার্য্যে যখন নবোপবীতধারীর কর্ণবেধ হয়, তখন সে চিরাগত প্রথানুসারে তোমার প্রতি সজোরে কদলীফল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পার যে, ইহাতে

তোমাকে কি বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়, কিন্তু তুমি ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং হাস্য করিয়া থাক। ইহা তোমার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। যাহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই, তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া কেবল মূর্খেরই কার্য্য। একদিন আমি আমার কোন বিদগ্ধ বন্ধুকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে একটি লাঙ্গুল সংযোগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "লাঙ্গুল দিয়া দাও, তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু লাঙ্গুলটি যেন সুবর্ণের হয়।"

তোমরা বুদ্ধিমান্ না হইলে তোমাদের বংশীয় কেহ কখন মগধের সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিতেন না। পশুদিগের মধ্যে যেরূপ শৃগাল, পক্ষীদিগের মধ্যে যেরূপ বায়স, মনুষ্যদিগের মধ্যে সেইরূপ তুমি। কিন্তু তাই বলিয়া কাক ও শৃগালের সহিত তোমার নাম একত্র গ্রথিত করা কবির উচিত হয় নাই। মহর্ষি পাণিনি যদি কুকুর যুবক ও দেবরাজকে (শ্বন্, যুবন্, মঘবন্) একসূত্রে গ্রথিত করিয়া শ্লেষভাজন হইয়া থাকেন, তবে যে কবি তোমাকে শৃগাল ও বায়সের সহিত একশ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ঐ শ্লোক রচনা করিবার পর সে কবিকে আজীবন কেশশ্মশ্রুভার বহন করিতে হইয়াছিল।

হে নরসুন্দর! তুমি নরকুলে ধন্য; যেহেতু অমর কবি মধুসূদনই লিখিয়াছেন, "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজনে"। যতদিন সভ্য-সমাজে

বাস করিব, ততদিন তোমাকে কথনই ভুলিতে পারিব না। বরং রজককে ভুলিতে পারি কিন্তু তোমাকে ভোলা অসম্ভব। অর্থ থাকিলে মলিন বস্ত্র একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিতে পারি, কিন্তু আমাদিগের মস্তকে ও গণ্ডক্ষেত্রে যে জান্তব উদ্ভিদ্ গজাইয়া উঠে, তাহার ছেদনের নিমিত্ত তোমায় চিন্তা করা ব্যতীত উপায় কি আছে ?

তুমি অগাধ বিশ্বাসের পাত্র। কয়জন বন্ধুর হস্তে আমরা অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু তোমার হস্তে আমরা জীবন দিয়াও বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদিগের কণ্ঠনালীর উপর তোমার সুভীষণ অস্ত্রটিকে আমরা অবাধে চালাইতে দিয়া থাকি। তুমি ইচ্ছা করিলে তদ্দণ্ডেই আমাদিগের জীবনগ্রন্থী ছিন্ন করিয়া দিতে পার, কিন্তু আমরা তথনও অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রফুল্লমুখে বসিয়া থাকি।

তোমার দুরধিগম স্থান অতি অল্পই আছে। যিনি যতই ধনী হউন, উচ্চপদস্থ হউন, বা আভিজাত্যসম্পন্ন হউন, তোমার নিকট তাঁহার দ্বার অবারিত। অপর লোকে যাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হয়, তুমি অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমন কর, এবং অবলীলাক্রমে তাঁহার কর্ণমূল আকর্ষণ করিয়া তোমার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া থাক !

তুমি একথানি সংবাদপত্র বিশেষ। তুমি প্রত্যহ নূতন নূতন সংবাদে সকলকে চমকিত করিয়া থাক। যথন তুমি তোমার প্রাতঃকালীন পর্যটনে বাহির হও, তথন তোমার মানস-পত্রিকার সংবাদ-স্তম্ভগুলি অপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি

পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তুমি যাহার নিকট গমন কর, তাহার নিকট হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাক, এবং সেই সংবাদ যখন তুমি অপরের নিকট আবৃত্তি কর, তখন তাহাতে স্বকপোলকল্পিত দুই একটি ঘটনা সংযোগ করিয়া দিতেও ভুলিয়া যাও না, অর্থাৎ এক কথায় সম্পাদকের সমস্ত গুণগুলি তোমাতে বর্ত্তমান।

তুমি বহুভাষী। প্রায়ই দেখিতে পাই ক্ষৌরকার্য্য করিতে করিতে তুমি অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছ। তোমার শ্রোতা বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, মনোযোগীই হউন, অমনোযোগীই হউন, শ্রবণশক্তিসম্পন্নই হউন, আর বধিরই হউন তাহাতে তোমার বিশেষ আসে যায় না। চেষ্টা করিলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বার্ক বা ডিমস্থানিসের মত বাগ্মী হইতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হে নরসুন্দর, তুমি নরকে সুন্দর কর তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বন্য পূর্ব্বপুরুষগণ এক্ষণ আমাদিগের চক্ষে অসুন্দর। যখনই আমরা নৈসর্গিক নিয়মে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তখনই তুমি আসিয়া আমাদিগের গতিরোধ কর এবং নখ-লোমাদি সাদৃশ্যগুলিকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত কর।

কিন্তু তোমাদিগের নিকট আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। তোমরা আমাদিগকে সুন্দর কর বটে, কিন্তু তোমাদিগের অনেকেই আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে, "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। তোমাদের ক্ষৌরকার্য্য যে একটি বিদ্যা এবং ঐ বিদ্যা যে কেবল সংস্কারগত নয় এইটুকু তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ।

যেরূপভাবে তোমরা সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হয় যে, কিছুকাল পরে ক্ষৌরকার্য্যের নিমিত্ত আর জলের আবশ্যক হইবে না, চক্ষের জলেই সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। এটা তোমাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে নয়, এইটুকু কেবল মনে রাখিও!

যশোহর,

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩২১।

মশকবধ কাব্য।

এই কাব্য নামের অনুপযুক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কাহাকেও ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। ছুছুন্দরীবধ কাব্যের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ৺মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাস্যাস্পদতা প্রতীয়মান করিবার দিন আর নাই। স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু দোষ ও গ্রাম্যতা দোষ থাকিলেও তাঁহার রচনা যে অনিন্দনীয় সে বিষয়ে কে সন্দিহান? তবে মশকবধ কাব্যের উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হাস্যরসোদ্দীপনায় জনসাধারণকে প্রীত করা। সেই নিমিত্ত মধুসূদনের অননুকরণীয় যৎসামান্য দোষগুলিকে ব্যঙ্গানুকরণের দ্বারা বৃহৎ করিলেও, আশা করি কোন সহৃদয় পাঠক উহা সংকীর্ণ-হৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন না। বরং বিজ্ঞ ও জ্ঞানী পাঠকসম্প্রদায় এই কাব্যখানিকে কবিবর মধুসূদনের দোষান্বেষী নিকৃষ্ট সমালোচকদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্য, সুমধুর শব্দঝঙ্কার ও অত্যাশ্চর্য্য ভাব-সন্নিবেশের প্রতি অমনোযোগী হইয়া উপরোক্ত দোষান্বেষণ যে কিরূপ ঘৃণিত ও কদর্য্য এবং তাহা কত সহজেই করা যাইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ 'মশকবধ'কে কেহ যেন সামাজিক নক্‌সা (Social

caricature) বলিয়া অনুমান না করেন। "ভারতোদ্ধার" কাব্যে যদিও বাঙ্গালীর শ্লিষ্ট চরিত্রাঙ্কন থাকে, তথাপি ইহাতে সেরূপ কোন পদার্থই নাই। আশা করি, কোন সুগভীর অনুসন্ধিৎসু পাঠক লেখকের সেরূপ উদ্দেশ্য সংগ্রহ করিবেন না।

তৃতীয়তঃ ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই কাব্যের নায়ক-নায়িকায় কোন বহির্জগতের ব্যক্তির ছায়া নাই। যিনি আপনাতে বা অন্য কোন ভদ্র-মহোদয়ে আমার কল্পিত নায়কের 'আসল' দেখিতে পাইবেন, আমি তাঁহার বুদ্ধি-প্রাখর্য্য অস্বীকার করি না, কিন্তু প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে আদালতসংক্রান্ত দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন। ইতি

প্রথম সর্গ।

বসে যথা নভস্তলে তারাদল সাথে
শশাঙ্ক, নিভৃতকক্ষে বসিয়া একেলা
বেষ্টিত মশকবৃন্দে আমিও তেমতি
হে দেবি ভারতি! তব উপাসনা রত
নির্ব্বাক্ নিশ্চল; হেন থাকি কতক্ষণ
সহসা চিত্তের বাঁধ যাইল টুটিয়া
ভীষণ আরাবময় ভীম প্রহরণে—
টুটে যথা সেতুবন্ধ বরিষার কালে
জলাশয়ে, কিংবা যথা তপোমগ্ন যোগী
হয়রে বিকলহৃদি অপ্সরা-সঙ্গীতে।
চাহিয়া চৌদিকে দ্রুত, হেরিনু পশ্চাতে

অগণন মশারাশি স্বশস্ত্রে সজ্জিত ;
কি ছার ইহার কাছে হে কমলাপতি
সে কৌরব অনিকিনী কুরুক্ষেত্রে যাহে
অভিমন্যু শূরে তব গোপনে বেড়িলা। '
ধ্বনিত হইল দেশ মম উচ্চারিত
উচ্চরবে মুহুর্মুহু, উঠিলা ফুলিয়া
গাত্র-কিসলয় মম হইয়া দাগড়া,
স্মরিলেও সেই কথা ক্লেশ হয় মনে।
ক্ষতমুখে সরিষার তৈল সিঞ্চনিয়া,
মুহূর্ত্তে মশারি-ব্যূহ রচিয়া কৌশলে,
প্রবেশিনু মধ্যে তার আমিও সুমতি
ভীম পরাক্রান্ত যথা দুর্য্যোধন বলী
দ্বৈপায়ন হ্রদমধ্যে পাণ্ডবে ছলিতে।
গণি নিরাপদ এবে লাগিনু চিন্তিতে
কেমনে সন্ধান পাবে ক্রূর মশাপতি
আমারে হেথায় পুনঃ, কিন্তু আচম্বিতে
শ্যামের বাঁশরী যথা বাজেগো বিপিনে
উদাসিয়া গোপিকার উতলা পরাণি,
বহিলা স্বরলহরী সুস্বন-স্বননে ;
কিংবা যথা বীণাযন্ত্র সুযন্ত্রি-তন্ত্রিত
কোমল কল-কাকলী তুলেক শিহরি
উঠিলা সে ধ্বনি ; আমি হায়রে কি ক'য়ে

কহিব সে দুখকথা, জানিনু তখন
পশেছে মশক মোর সূত্র-ব্যূহ মাঝে
পাপিষ্ঠ, মুহূর্ত্তে বিশ্ব ঘুরিল নয়নে
লাটিমের মত, জ্ঞান হল মনে হেন
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নাদি গর্ব্ব-মদস্ফীত
আসিছে বিপক্ষ মোরে জিনিবার তরে।
সাহসের তরবারি টানিনু সবলে
কাঁপাইয়া হৃদি-খাপ্ যেন ঝন্‌ঝনে,
ক্রোধাগ্নিস্ফুলিঙ্গদীপ্তি দীপিল তাহায়
মার্ত্তণ্ডময়ূখে যেন, উঠিয়া ত্বরিতে
দ্রুত ইরম্মদ-বেগে আইনু বাহিরে
চীৎকারিয়া ভীমরবে,—"রে পাষণ্ডগণ!
ভেবেছিস্ মনে মনে ক্ষীণ-বাহু আমি
না পারি শাসিতে সবে; দেখিবি নিমেষে
কি ভুজ-বিক্রম হেথা আছে লুকাইয়া
অদৃশ্যে, যেমতি থাকে দেব বৈশ্বানর
চুল্লীর জ্বলনহেতু ইন্ধন মাঝারে।
এত বলি ক্ষিপ্তপ্রায় লাগিনু ভ্রমিতে
পাখাহস্তে গৃহমাঝে লম্ফঝম্প দিয়া
কড়মড়ি ভীমদণ্ড, যাইল খসিয়া
বসন কাঁকল হতে প্রচণ্ড-তাণ্ডবে।
কখনো দু-হাতে করি পাখা সঞ্চালন

আঘাতিয়া পৃষ্ঠদেশে পাড়িনু কাহারে
ভূতলে ; মূৰ্চ্ছিত কেহ পড়িল ঘুরিয়া
চিরনিদ্রাতরে ; কারে ধরি মুষ্টি মাঝে
নিস্পেষিনু রক্তহস্তে, মারিনু কাহারে
ভীষণ ওজন চড় ; মিশাইয়া গেল
অস্থিহীন ক্ষুদ্রকায় করতলে, যথা
মিশায় পেরেক কোন কাষ্ঠের ভিতর
ছুঁতোর মুগুরাঘাতে। কিন্তু স্বীকারিব
যুঝিলা মশক সত্য বীরত্ব-বিক্রমে
নাহি ভঙ্গ দিলা রণে, পরন্তু দ্বিগুণ
সাহসে করিয়া ভর দিলেক কামড়
কেহ বক্ষে কেহ চক্ষে কেহ পৃষ্ঠদেশে।
কুঞ্চিত কৈশিক বর্ম্ম কেহ বিদারিয়া
বিঁধিলা শতেক শরে মস্তকচর্ম্মিকা
শোষিলা শোণিত কণা কে পারে গুণিতে।
বাহি নাসারন্ধ্র কেহ উঠি ভন্‌ভনি
হাঁচাইলা মোরে, আমি হইয়া কাতর
নিস্তেজ পড়িনু শুয়ে শয্যার উপরে
ঘুরিয়া, মারীচ যথা স্বর্ণ লঙ্কাধামে
হাঁফাইয়া ঘন ঘন, যুড়ি করপুটে
মাগিনু নিষ্কৃতি ; হায় মশকের কাছে
হ'য়ে পরাজিত হেন কেন না মরিনু

তখনি ? কেননা গেল বাহিরিয়া প্রাণ
অলক্ষ্যে অম্বরপথে দেহরথ হ'তে
অবসিয়া জ্বালা ? ক্রমে যাইলা রজনী,
সৌরকররাশি আসি পশিলা প্রত্যুষে
আমার আঁধার কক্ষে, একে দুয়ে সবে
পলাইলা মশাকুল, শ্রমক্লান্ত তনু
হেলায়ে তাকিয়া পরে কহিনু চেঁচায়ে,
"মিটাব সমর আশ কল্য আয়োধনে
নিশাগমে" , মনে মনে শুইয়া শুইয়া
করিনু প্রতিজ্ঞা এক অতি ভয়ঙ্কর
মশকের অত্যাচার প্রতিবিধিৎসিতে।

ইতি মশকবধকাব্যে প্রতিজ্ঞা নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

কোথায় সেতারপাণি কমল-আসনা
বাগ্‌দেবি, দেহ শক্তি মোরে কৃপা করি
বর্ণিবারে মশকের বিচিত্র কাহিনী ;
বস আসি কলম-জিহ্বায় দয়াময়ি
বসেছিলে যথা যবে ভারত-উদ্ধার
ছুছুন্দরী-বধ আদি বিদিত জগতে

৮

মহাকাব্য, হয়েছিল আপনি উত্থিত
লবণবারিধি হ'তে অমৃত যেমতি
অমরিতে ; কোন্ তপে বলগো জননি
হাড়ের হ্যাণ্ডেলযুক্ত ষ্টীলের লেখনী
পাইবে তোমারে ? দেখ নাহিক আমার
ময়ূরের সিংহাসন অথবা হংসের
মানসসরসচারি, যাহে প্রিয় তুমি।
কিন্তু মা এ রীতি তব বিখ্যাত জগতে
(অপবিত্র স্থান বলি নারিবে ঘৃণিতে)
চণ্ডালে করুণা কর ব্রাহ্মণে পাশরি।
তেঁই আজি স্মরি তোমা বিশ্বাসেতে বলী
উরি দেবি দেহ মোরে ভাষা ও কল্পনা
মানস-উদ্যানজাত, পূজিব এ ফুলে
কোমল চরণযুগ, নৈবিদ্যি যতনে।

তরুণ অরুণ রশ্মি ভাতিল জগতে
দূরিয়া তামসপুঞ্জ, দূরিলনা তবু
গাত্রদাহ সেই সনে অথবা বেদনা ;
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নারিনু শায়িতে
আপনারে, শুধু চিন্তা লাগিলা অটিতে
উদ্দাম দাবাগ্নি যথা হিমগিরিকূটে।
ভাবিলাম, কোন্ বলে ক্ষুদ্রপক্ষধারী

পচাজলজাত মশা এতেক দুর্জ্জয় ?
কেমনে জিনিলা মোরে অবলীলাক্রমে
শার্দ্দূল-সদৃশ আমি ? হায় দুখকথা
স্মরিলে এখনো নেত্র হয় কলুষিত,—
আস্ফালন আক্ষেপণ সকলি আমার
হইল নিষ্ফল, হায় হয় যথা যবে
অযুত দংশনদগ্ধ মহীলতা বলা
পিপীলিকা-পরিবৃত ; হায়রে বিধাতঃ
এই কিরে ছিল লেখা এ পোড়া কপালে ?
দারুণ রহস্য, প্রহেলিকা কুজ্ঝটিত,
তথাপি নহেক মিথ্যা ইন্দ্রজাল যথা,
কিন্তু সত্য, সাক্ষী তার পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা।
সিন্ধুপয়ঃপূর যবে তট অতিক্রমি
ফেনিল তরঙ্গ সনে হয় উচ্ছ্বসিত
ঘোররবে, হেতু তার অদৃশ্য যদ্যপি
সুধাংশুর আকর্ষণ ; সেইরূপ হেথা
অতি দূরতম কোন অজ্ঞাত কারণ
আছে বর্ত্তমান, তাহা অনন্যসন্ধানি
করিবনা জলস্পর্শ মননিমু মনে।
সহসা জ্ঞানের দ্বার হল উদ্‌ঘাটিত,
মূর্খতা-হুড়ুকা গেল সরি হড়হড়ি
অবিরল চিন্তাস্রোতে, পাইনু দেখিতে

মশকের বলবীর্য্য রয়েছে বেড়িয়া
একতা ও সংখ্যাবলে ; হায়রে যেমতি
বেড়ে চাটুকারী-লতা সুবর্ণ-মোহর-
সহকারে, কিংবা যথা উমেদার মাছি
মধুলুব্ধ থাকে লাগি প্রত্যাশার ভাঁড়ে
দিবারাত্র ভন্‌ভনি মৃল্লিপ্ত কাণেতে।
তাই বলবান্ এত মশকসংহতি
ভাবিলাম পুনর্ব্বার ; নতুবা কেমনে
অর্ণববিহারী সেই দিব্য জলযান
নির্ম্মিত ওকের দেহে পালিসিলা যাহে
বিলাতীয় বিশ্বকর্ম্মা কারিকরবেশে
যায় ডুবি, যবে ক্ষুদ্র বালুকার কণা
জমে চারিধারে তার বরফীর মত,
জারকিয়া হতভাগ্য মজ্জিত যাত্রিকে ?
ক্ষুদ্রই বিনাশ করে বৃহতে নিয়ত
চির-সত্য এই কথা, নতুবা কি কভু
বৃহৎ সজিনা-শাখা, ঝঞ্ঝাবায়ু যাহে
পরাস্ত, ভিতরে ঘুণ লাগি অবশেষে
ঝুপ্ করে একদিন পড়ে গো মাটিতে ?
কিংবা সে বদরী-অষ্ঠী পড়ি পদতলে,
মত্ত দ্বিরদের করে জীবন সংহার
বৃহৎ কপিত্থ যেই গিলে অনায়াসে ?

হেন বহু চিন্তা মনে উলটি পালটি
বুঝিনু কৌশল বিনা শারীরিক বলে
কি ফল ? বিফল তাহা শারদাভ্র যথা ।
চতুরতা বিনা কিগো সুমিত্রানন্দন
লক্ষ্মণ লক্ষণযুত পারিত জিনিতে
ত্রিলোকবিজয়ী সেই মেঘনাদ শূরে ?
তাই চতুরতা বলে করিয়া বিনাশ
মশক-একতা আগে, পরে একে একে
করিব রে সমূলে নির্ম্মূল সবাকারে ।
এরূপ করিয়া স্থির প্রফুল্ল অন্তরে
তাড়াতাড়ি আহারিয়া ত্বরিনু আফিসে ।
ইতি মশকবধকাব্যে যুক্তিনির্দ্ধারণো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ ।

পশেছেন দিনমণি অস্তাচলশিরে
রাঙ্গাইয়া তরুশির, জুড়াইছে ক্রমে
ধরণীর তপ্তকায় সায়াহ্ন-পবনে ।
কুমুদিনী মেলি মেলি করিয়া নয়ন
শৈবাল-সরসী হ'তে, পঙ্কমধ্য দিয়া
না হেরি চন্দ্রমা, আছে হইয়া মুদিত ;

হায়রে যেমতি কোন পেটুক ব্রাহ্মণ
নিমন্ত্রণ-গৃহে মগ্ন ভোজন-স্বপনে
সহসা যুগল আঁখি আধ উন্মেষিয়া
আলস্যে, বর্ত্তুল-শশী না হেরি উদিত
তখনো গগনপাতে, আবার ঘুমায়।
    হেনকালে ধীরপদে গজেন্দ্রগমনে
ফিরিলাম গৃহে আমি, যেমতি বলদ
সারাদিন লাঙ্গলিয়া ফিরয়ে গোয়ালে
সন্ধ্যাকালে, দুই মুঠা জাব পাইবারে।
কিন্তু যা হেরিনু তাহে উড়িলা পরাণি
ভীতিভরে ; ভ্রমিছে গৃহিণী গরগরি
বাড়ু নিয়া প্রতিগৃহ ক্রোধভরে যেন
মর্ম্মরি অস্ফুট রবে ! ত্রাসিত-চরণে,
অগ্রসরি যত্নভরে সম্ভাষিণু তাহে—
"কি হেতু প্রেয়সি আজি এহেন মূরতি
হেরি তব ? যেন বহ্নি ধূমাইছে সদা
আগ্নেয়পর্ব্বত সম অন্তরে তোমার !
কোন দোষে দোষী অয়ি চামুণ্ডা-রূপিণী
এ দাস চরণে তব ? কহ ত্বরা করি
(ভয়ে কণ্টকিত গাত্র, বহে স্বেদধারা)
কোন্ পূজা আছে বাকি, বল কোন্ বলি
দিই নাই, দিব আজি তোমা সন্তোষিতে।

কি কাজ বিলম্বে, কহ কহ শীঘ্র করি—
অস্থির জীবন মোর বাহিরায় বুঝি।”
আরম্ভিলা প্রিয়ম্বদা ; ঝরিলা সে বাণী
কুলিশপয়োদ হ’তে সুশীতল বারি
ঝরে যথা অবিরল ঝম্ ঝম্ ঝমে ;
কিংবা যথা প্রজ্বলিত ভীম হুতাশন
পাইলে সোহাগধূপ-আহুতি, উগারে
প্রচুর সুগন্ধ মন্দ ধূমি গলগলি।
কহিলা অর্দ্ধাঙ্গহরা, “কিহেতু প্রাণেশ
জ্বালাও এ জ্বলা-প্রাণ প্রণয় বচনে ?
জান না কি অরুন্তুদ ক্ষত ব্যথাযুত
করুণা-অঙ্গুলিস্পর্শে পুড়ে গুরুতর ?
জীবন-সলিতা মোর যাউক নিভিয়া
অবহেলা-তৈলাভাবে আপনা আপনি,
কি কাজ উস্কিয়া বৃথা মৌখিক যতনে ?”
নীরবিলা প্রাণেশ্বরী ; শেষ কথাগুলি
মিলাল অধরপুটে অতি ধীরে ধীরে,
মিলায় রাগিনী যথা উদারাপ্রদেশে
সুদক্ষ গায়কমুখে, তানপুরা-তানে।
অথবা সে বাষ্পস্বর গলিয়া জিহ্বায়
প্রকাশিল পুন আসি নয়নের কোণে
নীরব-বাগ্মিতাযুত, যেমতি অম্বরে

টলটলি জলধর জানায় অধিক
বরিষণ চেয়ে! তাই, এখনো আমার
সজোরে ধ্বনিতেছিল শ্রবণবিবরে
'অবহেলা-তৈলাভাব' এই শব্দ দুটি।
কি অর্থে অন্বিত এরা কে কবে আমায়
প্রেয়সি-হৃদয়-গ্রন্থে? বিদ্বান্ যদ্যপি,
নানা কাব্যে সুপণ্ডিত, পলিটিক্‌সে জ্ঞানী
হইনু ব্যাকুল তবু বুঝিতে ইহায়।
অনুভবি হৃদে যেন সংশয় আমার
লাগিলা উত্তরচ্ছলে এবে প্রিয়তমা
কহিতে আবার, (হায় কুল্লুক-ব্যাখ্যান
কে বাখানে এর পর? হেরিনু নিমেষে
অর্থের যোজনা যেন নখের দর্পণে।)
"সারারাতি রজনী নাথ ছিলে মনোযোগী
পাঠাগারে, পাঠে মগ্ন, হেথা অভাগিনী
একেলা সয়েছে শুয়ে কত যে দুর্গতি
কেমনে কহিবে, আর কত যে লাঞ্ছনা
ভুঞ্জিয়াছে অসহায়, মশকের হাতে?
মশারি আছিল ফুটা একস্থানে শুধু
অতিক্ষুদ্র, কিন্তু তবু তারি মধ্য দিয়া
প্রবেশি চতুর মশা খেয়েছে আমায়"।
কাতর বারতা এই শুনিনু যখন,

কত যে অন্তরে আমি হইনু কাতর
জানেন বিধাতা, কিন্তু না জানি কি হেতু
(হায়রে কেমনে কব সে পোড়া কাহিনী ?)
ক্রন্দন যদ্যপি মোর আছিল উচিত,
সহসা উঠিনু হাসি উচ্চে খলখলি
পাপমুখে, কোন ক্রমে নারিনু দমিতে
হাসির দমকা আমি প্রাণপণ বলে।
কহিনু সত্বরি, "প্রিয়ে যে গতি তোমার
আমারো তাহাই ; দেখ সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া
(খুলিয়া পিরাণ জোরে দেখানু তাহায়)
রহিয়াছে মশকের দংশনের দাগ।
কিন্তু দুঃখ নাহি তাতে ও বরাঙ্গ তব
যদি না সহিত এই দারুণ যন্ত্রণা।"

এতেক শুনিয়া কান্তা ঈষদ্ হাসিয়া
গুটাইলা কোপজাল, কপোল-রক্তিমা
হ'ল অপসৃত, হায় সহসা যেমন
প্রকৃতি-সংহার-মূর্ত্তি সৃজনপ্রমুখে।
কিন্তু যথা কিরাতের অমোঘ বন্দুক
বিহঙ্গম লক্ষ্য ভুলি বিঁধে পথিকেরে
বক্ষঃস্থলে, তেমতি এ কালক্রোধ-ইষু
হৃদয়-শিঞ্জিনী পরে হইয়া টঙ্কৃত,
প্রচণ্ড দম্ভোলীবেগে ধাইল তখন

বক্রগতি, একেবারে ছাড়ি প্রাণপতি
মশাকাভিমুখে ; সঙ্গে উঠিলা নির্ঘোষ
গুরুগুরু গরজনে নিন্দিয়া জলদে
"আজি প্রাণেশ্বর তুমি দেখিবে নিশ্চয়
যদ্যপি অবলা আমি, অস্ত্রশিক্ষাহীন,
বধিব একাই মশা ; কার সাধ্য রাখে
আসে যদি আশুতোষ আপনি তথাপি ?"
ত্রস্ত শুষ্ক তালু মোর রসনার রসে
ভিজায়ে, কহিনু আমি,—"সাবাসি তুহায়
আজিলো প্রেয়সি, অয়ি বীর-মাতঙ্গিনি
রমণী-ললামভূতা, সাবাসি এ তব
বীরপণা, চির-অরিন্দিমা বামা তুমি
এ বীরত্ব সাজে তব ; কিন্তু শুন ধনি
আমারো প্রতিজ্ঞা আছে আজি রজনীতে
নাশিতে মশকবৃন্দে, তাই মোর, সনে
মিল আসি সহায় হইয়া মোর, যথা
মিলে প্রভঞ্জনে সান্দ্র করকার ধারা
প্রান্তরে পথিকশির করি গুঁড়াগুঁড়া।
করিয়াছি স্থির আমি বহু চিন্তা পরে
যুকতি, যাহার বলে বাঁদর যেমতি
নাশে ভীমকুলদলে, রহিয়া বাহিরে
কৌশলে, নতুবা প্রাণ হারায় দুর্ম্মতি ;

মারিব সকল মশা স্বল্প পরিশ্রমে" ।
এতবলি কাণে কাণে কহিনু তখন
একতাবিনাশ-বার্ত্তা, হায়রে যেমতি
মূলমন্ত্র দীক্ষাকালে শিষ্য-কর্ণপুটে ।
কহিলাম অতঃপর "শুনলো ললনে
শাস্ত্রে বলে নারী-বুদ্ধি স্বতই মার্জ্জিত
কার্য্যক্ষেত্রে পটু, মোরা পুরুষ কেবল
যুক্তি-তর্ক-সার, তাই জিজ্ঞাসি তোমায়
পার কি বলিতে কোন সদুপায় যাহে
কল্পনা ঘটনারূপে হয় পরিণত ?"
এতবলি ক্ষণকাল রহি বাক্যহীন
প্রতীক্ষিয়া প্রিয়াবাণী, কহিনু আবার
"মনে মানি হেন তব মৌনতা হেরিয়া
উপায় কোন না কোন ও চারু মস্তকে
উঠেছে উর্ব্বরক্ষেত্রে শ্যাম শষ্প যথা ।
কহ তা আমারে অয়ি, করিতে শ্রবণ—
তৃষিত চাতক যথা নবঘন পানে
আছি তব পানে চাহি, উৎসুক-অন্তর ।
প্রণয়ের দিব্য দিয়া সাধি লো তুহারে
চরিতার্থ কর মোর তীব্র কৌতূহল ।
উত্তরিলা মনোরমা "নাহি প্রয়োজন
শুনিয়া সকল অগ্রে, হেরিবে তখনি

স্বচক্ষে, বিপক্ষপক্ষ নাশিবার কালে”।
এত বলি গেলা চলি সমরসঙ্গিনী
করিবারে আয়োজন যাহা যাহা লাগে।
অতঃপর একা আমি লাগিনু ভাবিতে
আজি কে হইল জ্ঞান কি হেতু বিধাতা
গঠিলা রমণীকুল, বুঝিনু নিশ্চয়
নরের সঙ্গিনী এরা যথার্থ জগতে।

ইতি মশকবধকাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

সমুচ্চ গগনশৃঙ্গে উঠিয়া ভাস্কর
জ্যোতির্ম্ময়-রশ্মিযুত দুর্ব্বার দুর্জ্জয়
এবে পড়িয়াছে খসি জলধির জলে;
হায়রে যেমতি কোন হতভাগ্য নর
একে একে আরোহিয়া সকল সোপান
ললাটলিখনবশে দ্বিতল হইতে
গড়গড়ি চক্রসম দিয়া গড়াগড়ি
প্রতিধাপে, পড়ে গিয়া নিম্নগৃহতলে
লোরপ্লুত-কলেবর রক্তিমবরণ।
হাসিছে কৌমুদীপতি হেরি এ দুর্গতি
মুচকিয়া মুহুর্মুহু; আধেক আবরি

জলদবসনে শুভ্র কলঙ্কি আনন ;
হাসে লুকাইয়া যথা মানবমণ্ডলী
মহতের অকস্মাৎ হেরিয়া পতন।
পবন ছুটিয়া চলে ব্রততী-শ্রবণে
দিতে এ রহস্য-বার্ত্তা, হাসিলা লতিকা
বিকসিয়া ফুলকুল নিঃশব্দ অধরে।
নামিলা রজনী ক্রমে তিমিরবসনা
গম্ভীর ভ্রূভঙ্গ-রঙ্গে, যেন তিরস্কৃয়া
চপলতা, ক্ষুদ্রতার চির পরিচয়।
হেথায় আঁধার কক্ষে শয়নভবনে
কিছু জলযোগ করি কম্পিত অন্তরে
বসিয়া রয়েছি আমি ঘুণজীর্ণ খাটে
ক্রোধে গরগর তনু, মশকপ্রত্যাশে ;
হায়রে যেমতি ছিল দ্বিতীয় পাণ্ডব
দ্বাপরে দ্রৌপদী-গৃহে কীচকে পীড়িতে
কিংবা যথা বনপথে বৃক্ষ তমসায়
ওত পাতি রহে বসি সলগুড় অরি।
দরজা জানালা সব রাখিয়াছি খোলা
প্রেয়সীর কথামত ; যেন ঢুকাইতে
জগতের যত মশা আজি মোর গৃহে।
কিছুক্ষণ পরে মোর পত্নী বীরজায়া
আমারি পার্শ্বেতে আসি লইলা আসন

হায়রে কিরূপে—তাহা কি বর্ণিব আমি
কবি নহি, হায় হায় কোথায় বঙ্কিম
কোথা শূরী হেমচন্দ্র, এস এস আজি
বাঁচিয়া মুহূর্ত্ততরে করিতে পূরণ
ভাষায় প্রাচুর্য্যে মোর ভাবের উচ্ছ্বাস।
বীরবালা কর্ম্মদেবী, চিতোর-পদ্মিনী
তেজস্বিনী ক্লিওপেট্রা কার সনে বল
তুলনিব সেই ভীম রণচণ্ডী-বেশ
দুর্ব্বিসহ তেজে ; হায় প্রমীলা যেমতি
রাঘবশিবিরে, কিংবা হেলেন সুন্দরী
স্বহস্তে খাণ্ডব সম করিতে দাহন
ট্রয়রাজ্য ; উপমা দিব বা কত আর,—
যত দিই তবু যেন কম কম লাগে।
কিংবা কেশরিণী যথা পশে দূর বনে
ব্যাদানি বিকট মুখ, উর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি,
আমূল পর্ব্বত যবে সগুহাশিখর
নড়ে ভূকম্পনে। নয়নে বিদ্যুৎ-বহ্নি জ্বলে
কালাগ্নি-সম্ভবা যেন, যেন বা কহিতে
কাহারে ডরাও তুমি হে জীবিতনাথ
আছি যতক্ষণ আমি জীবন ধরিয়া,
নাহি কি শকতি আমার ? সিংহিনী আমি,
আমি কি ডরাই সথা অসার মশারে ?

হেনকালে উতরিলা চরণপ্রদেশে
অনুচর শশব্যস্তে ; (বালক যদ্যপি
নহে অর্ব্বাচীন তবু) বাহি একহাতে
গৃহিণীর আজ্ঞামত দুগাছি বাড়ুন,
আর ঝাঁটা একগাছি, ভদ্রে যারে কয়
সম্মার্জ্জনী ; প্রাঙ্গণের চির-সোহাগিনী,
মুছায় যে ধূলিময় বদন তাহার
আপনার করে। বাহি অপর হস্তেতে
জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ আনিলা ধূনাচি।
এতক্ষণে দূর হল সমস্যা আমার,
বুঝিলাম এই হ'ল সমরায়োজন।
যথাস্থানে রাখি সবে সুন্দরী তখন
জ্বালিলা প্রদীপ, আর কহিলা চাকরে—
আজি আমাদের সনে থাকিবি হেথায়
নিদ্রা তেয়াগিয়া, হায়, মশকের ধ্বনি
শুনি প্রভুভক্ত ভৃত্য মনিবের পাশে,
কভু কি অলসভাবে থাকেরে ঘুমায়ে ?
মশকের ধ্বনি ক্রমে বাজিলা গভীরে
বাজে নহবত যথা বৈজয়ন্ত-ধামে ;
সুরে সমাচ্ছন্ন গৃহ হইলা অচিরে।
সজ্জিত মশকসেনা হেরি তবে আমি
কহিলাম, "প্রেয়সি লো শুন এ বাজনা

মশকের ; আহ্বানিছে ত'ারা ফুটাইয়া
হুলঅস্ত্র ; আর কেন ? করহে সংহার।
দরজা জানালা তবে রুধি হুড়্কায়
তুলা দিয়া ফুটাফাটা দিলেক অ'াটিয়া
গৃহিণী ; চাকর দিল পাখার বাতাস
ভন্ ভন্ রবে মশা দ্বিগুণ নাদিল।

ইতি মশকবধকাব্যে আয়োজনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাধিল বিষম যুদ্ধ ; কিন্তু সাধ্য কার
টেকে মশকের রণে ? গর্জ্জিয়া কামড়
দিলেক সকল অঙ্গে, লাগিলা বিঁধিতে
যেন রে কলম্বকুল অম্বর হইতে
সেন্ল্যাকে। আমরাও করি প্রাণপণ
সহি তা বিক্রমে ; যথা আরণ্য মহিষ
নতশৃঙ্গে লয় ধরি বরষার ধারা
অবিরল, ক্রোধভরে। চৌদিকে এবে
উথলিল প্রহার-তরঙ্গ ঘোর রোলে,
করতালি বাজিল নির্ঘোষে, মেঘমন্দ্রে
গরজে মশকচমূ দেবনরত্রাস।

ধূনায়ে ধূনাচি তবে সাধ্বী প্রিয়তমা
সাঁজাল গোগৃহে যথা দেয় গোপবালা
সায়াহ্নে, করিল কক্ষ ধূমে গুল্‌জার।
একতা হইল ছিন্ন, মশকসংহতি
যে যার পৈত্রিক প্রাণ বাঁচাবার তরে
ছুটিলা, পড়িলে ব্যাঘ্র গড্ডরিকা দলে
ছুটে শ্রেণীবদ্ধ ভাঙ্গি যেমতি প্রত্যেকে।
তথাপি অসংখ্য মশা উড়িলা সতেজে
হুতাশ-দুর্জ্জয়; যেন শতগুণ বলী।
কিন্তু অবশেষে পাখা গেল জড়াইয়া
ধূনার আঠায়, তাই নারি উড়িবারে
বসে চারিধারে কেহ খাটের পায়ায়,
কেহ প্রাচীরাঙ্গে, কেহ ঝোলে কড়িকাঠে।
অপার বুদ্ধির খনি গৃহিণী তখন
দীপহস্তে খুঁজে মশা তন্ন তন্ন করি
সহসা পুড়ায়ে পাখা ডুবাইতে তেলে,
খুঁজেছিল হায় যথা অঞ্জনা-নন্দন
বিশল্যকরণী লতা, গন্ধমাদনেতে।
এইরূপে কত মশা গেলা স্বর্গপুরে
অকালে, পাবকমুখে, কিন্তু গুণে গুণে
নিঃশেষ কি করা যায় সাহারার বালি?
যার তরে যে বিধান তাহা না করিলে

সুসিদ্ধ কি হয় কার্য্য ? একখানি গৃহে
লাগে বহ্নি যদি, নিভে কলসীর জলে ;
কিন্তু বহু গৃহ যদি হয় দহ্যমান,
দমকল বিনা তাহা নিভিবে কেমনে ?
উপকারী চূণপড়া সামান্য ব্রণেতে
জানে লোকে, কিন্তু বল কে কোথা শুনেছে
সারিয়াছে চূণপড়া কারবন্‌কেলে ?
ক্রমে মন্দীভূত ধূম, সহসা আবার
উড়িল মশকবৃন্দ ঘোর কোলাহলে ;—
উড়ে বায়সেরা যথা বিকট চীৎকারে
গাছেতে বন্দুক যদি মারেরে শিকারী।
বধির হইল কর্ণ ; লইনু তখন
মহাপ্রহরণ সেই দুগাছি বাড়ুন
আমি ও চাকর, নিলা তুলি চারুকরে
প্রিয়া শতমুখী, মৃত্যুঞ্জয় শেল সম
ভীষণ-দর্শন ; হায় দানবদলনী
আবার ত্রিশূলহস্তে যেনরে নামিলা
ভূতলে, অথবা যেন হইল উদয়
ধূমকেতু অকস্মাৎ গৃহের মাঝারে।
যেমন কুক্কুর তারে লাগে প্রহারিতে
তেমনি মুদ্গর ; তাই দুর্দ্ধর্ষ মশকে
আক্রমিনু কাল যথা, ভীমদণ্ড লয়ে।

পলাইতে হেরি কারে. করিনু বা কভু
পশ্চাদ্ধাবন, কভু মস্তকের পরে
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, ঘুরানু বাড়ুন
মণিবন্ধে যত শক্তি সব জড় করি।
দুপ্ দাপ্-শব্দশালী ষট্ পদাঘাতে
থরথরি কাঁপে দ্বার, খসি পড়ে ছাদ
যেন ভূকম্পনে ; মুখে মার মার শুধু
নাহি অন্যরব, কভু উর্দ্ধে কভু নীচে
কভু লম্ফদিয়া উঠি খাটের উপর
রাবণবিমানে যথা উঠেছিলা বীর
মর্কটকুলতিলক অঙ্গদ ত্রেতায়।

এইরূপে তিনজনে যুঝি অবিরাম
কত বা আঘাতি পরস্পরে ; কেমনে কহিব
কত যে পাইনু আয়াস, মশকে জিনিতে।
ঝুলে ঝুলময় দেহ যেন মসীমাখা—
কি বিচিত্র চিত্র,—মরি দ্বাদশ বৎসর
কয়লা-খনিতে যেন করিয়াছি কাজ।
সহসা নিভিলা দীপ ঝাঁটার তাড়নে
তথাপি চলিলা রণ ; কেবা ক্ষান্ত হয় ?
যথা যবে আধুনিক সমরপ্রাঙ্গণে
বারুদের ধূমে দৃষ্টি করিলে নিরোধ
তথাপি সৈনিক রণ করে নিরবধি।

বুদ্ধ তেয়াগিয়া বল কে জ্বালিবে আলো ?
হইল না জ্বালা, হায় হয় না যেমন
যবে গুলিখোর দল বসিয়া বিভোর—
এ উহারে কহে ডাকি জ্বালিতে প্রদীপ,
নেশা চটাইয়া কেহ উঠিতে না পারে।
সহসা ভীষণ রবে গর্জ্জিয়া প্রেয়সী
অন্ধকারে, মারে ঝাঁটা আমারি উপর
অবিরত, অপূর্ব্ব দাপটে মরি যথা
আটকৌড়ি দিনে কুলা পিটেরে বালক।
চাকর আঁধারে হয়ে দিগ্বিদিক-হারা
সেও মারে লাথি চড় দু'জনার পিঠে।
কহিনু কাতরকণ্ঠে উচ্চে বিলাপিয়া
"সম্বর সম্বর প্রিয়ে, হনু আধমরা
প্রচণ্ড আহবে তব, রুধির বহিছে
ছিঁড়ি পৃষ্ঠদেশ মম, দড়মা-সদৃশ
আড়ে ও টানায় দাগ দিয়াছ বুনিয়া।
হ'রে ! হ'রে ! কোথা ওরে ত্বরায় প্রদীপ
জ্বাল্ এই বেলা ; মূর্খ হতভম্ভ দাস
মমতা যদ্যপি থাকে ; শোন্‌রে বানর
প্রেয়সীর রণে আজি মশক তো ছার,
কাহারো নাহিক রক্ষা কহিনু নিশ্চয়।
তিতিল নয়নজলে কলেবর মোর

কচুপত্র যথা, কিংবা কমল-পলাশ।
কহিলা চাকর বাষ্প গদগদভাষে
আধ জড়াইয়া, যেন পারে না কহিতে—
"ঝটিতি ঝাড়ুর ঝাটে পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
অভাগা বিদেশে আসি, হারাইনু বুঝি
মাঠাকুরাণীর হাতে নয়নযুগল।"
কহিলাম আমি, "এবে কি ফল বিলাপে?
উঠ, উঠ ত্বরা করি; না পাও দেখিতে
হাতাড়িয়া ম্যাচবাক্স জ্বালরে প্রদীপ:—
অদৃষ্টের লিপি বল কে পারে খণ্ডাতে?"
অতিকষ্টে উঠি তবে জ্বালিল প্রদীপ:—
কাঁপিতে কাঁপিতে আমি হেরিনু সভয়ে
নাচিছে সমর রঙ্গে বিলোলকুন্তলা
ভীষণ ভৈরবী বামা, নেচেছিল যথা
শতশীর্ষধারি সেই রাবণের রণে
(শ্রীরাম লক্ষ্মণ হ'লে ভূতলে পতিত)
জনকতনয়া নিজে রণকালীবেশে।
দর দর ঝরে ঘাম কপোল বহিয়া,
যেন চুমিবারে রাঙ্গা চঞ্চল চরণ
ত্রিদিব-লাঞ্ছিত। কভু উঠিছে হুঙ্কার
রহিয়া রহিয়া, ঘোর অরণ্যের মাঝে
উচ্ছ্বাসে শ্বাপদ যথা; শব্দ শুনিয়া

স্তব্ধ প্রতিবাসী যত মনে অনুমানে
দ্বন্দ্ব ও প্রহার ঘোর স্বামী পরিবারে
মশাল নাহিক তাই দস্যু নাহি ভাবে।
        নিশা অবসানে কিছু পড়িলা নরম
তুমুল ব্যাপার ; প্রিয়া লভিলা সম্বিৎ,
যথা রোগী পায় জ্ঞান ভুগি সারারাতি
অবিরাম-জ্বরে প্রত্যুষে। সযতনে,
প্রকৃতিস্থ করিলাম ভৃত্যের সহায়ে
শীতল বরফজল ধারায়ে মস্তকে
ক্ষণকাল। গাঢ়স্বরে কহিলা প্রমদা—
"মারিয়াছি মশাকুল তোমার প্রসাদে
হে নাথ! সবংশে আজ কহিনু তোমায়,
তুমি আশীষিলা বলি ; তেঁই সমাদরে
প্রণিপাত করি পদে আরাধ্য দেবতা।
কিন্তু একি হেরি তব? রুধিরের রেখা
কেন ও বরাঙ্গে? তবে পাপিয়সী আমি—
আমি কি করেছি তব ও হেন দুর্দ্দশা
অজ্ঞানে? কত না পাপ করেছি সঞ্চয়,
ক্ষম অপরাধ প্রভু ; জুড়ি যোড়কর
চাহি কৃপাভিক্ষা তব, ক্ষম এ দাসীরে।
ছিল আশা হাসিমুখে উল্লাসে মাতিব
তুমি, আমি দুইজনে ; কিন্তু একি দুখ

মারিতে মশকে আমি মারিনু তোমায় ?
ছিল আশা রাঁধি কোপ্তা কালিয়া কাবাব
বিজয় উৎসবে যথা তোমারে খাওয়াব
খাইব আপনি ; ঢালি সুরাসার বলি
মিছরির পানা সুখে খাইব দুজনে।
ছিল আশা মনে মনে,—কিন্তু হায় হায়
এই কি লিখিলা বিধি এ দাসীর ভালে ?"

মুছায়ে নয়নবারি পকেট রুমালে
কহিলাম, ধীরে ধীরে "কি দোষ তোমার
প্রণয়িনি ? ফুটবল খেলিতে খেলিতে,
নিজগোলে কতবার পূরিয়াছি বল
শত করতালি আর টিট্‌কারী মাঝে।
বিধির সে বিড়ম্বনা ; কার ইচ্ছা বল
কুঠারে কাটিতে কাঠ, ছেদে আপনার
চরণ ; কাহার ইচ্ছা আপনি মজিতে।
তা বলে আনন্দরোধ কে করেছে কবে ;—
বিমর্ষ কে কবে বল শত্রু বিনাশিয়া ?
একটি মশক আর না করিছে রব ;—
হায়রে মড়কে গ্রাম হইল উজাড়
কে কার কারণে বল করেরে রোদন ?
অদ্ভুত বিক্রমে তুমি সম্মুখ সমরে
যেমতি বধিলে মশা, রাখিলে না কারে

মশাকুলে দিতে বাতি, হ'লে অন্ধ দেশ
এরিমধ্যে তব গলে ঝুলিত পদক
কাঞ্চনের হারে, তব বীরত্ব-বর্ণনা
অতিরিক্ত ক্রোড়পত্রে হ'য়ে প্রকাশিত
মোহিত জগৎ; হায় মানবী কি তুমি—
অথবা কি দেবী হয়ে দাঁড়াইলা মোরে ?
যারে দাস দ্রুতগতি এখনি বাজারে,
গরম গরম লুচি রাবড়ি সন্দেশ
আন্‌রে কিনিয়া; আর সজোরে সঘনে
বাজারে বিজয়ডঙ্কা মহাকুতূহলে।"
খুলি দ্বার তার পরে আইনু বাহিরে
দম্পতি; প্রভাতকালে পুলকিত মনে
মর্দ্দিয়া দুর্ম্মদ রিপু; শুষ্ক তোয়ালেতে
মুছি গাত্র কালিঝুলি করিলাম দূর
যতটা সম্ভব। পরে সাবানিনু দেহ
মাখিনু সুরভি তৈল; খুলিয়া ঝাঁঝরি
গাহন করিনু সেই পবিত্র সলিলে।
এরূপে মশক বধ করিলাম শেষ
বীরপত্নী সনে মিলি; ঘুচানু ভাবনা
দুইটি রজনী সারা জাগিয়া বিষাদে।
ইতি মশকবধকাব্যে বধো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ভবানীপুর, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২২।

টাকা।

—:•:—

"Men work for money, fight for it, beg forit, steal for it, starve for it and die for it. And all the while from the cradle to the grave nature and God are thundering in our ears the solemn question "What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul." This madness for money is the strongest and lowest of the passions. It is the insatiable Moloch of the human heart before whose remorseless altar all the finer attributes of humanity are sacrificed. It makes merchandise of all that is sacred in human affection and even traffics in the awful solemnities of the eternal world."

যিনি শাসনদণ্ড পরিচালন করেন ও রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাপন্ন তিনিই রাজা। প্রকৃতিরঞ্জন অর্থাৎ প্রজার প্রীতি সম্পাদনও তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রাজনামধারী জীব আছে। রাজা এক ব্যক্তিই হউন, যেমন রুষিয়ার; বহু ব্যক্তিই হউন, যেমন পুরাতন গ্রীসে; অথবা জনসাধারণই হউন, যেমন ফ্রান্সে তাহাতে কিছু আসে যায় না। মোটের উপর রাজলক্ষণাক্রান্ত কেহ যে দেশে নাই, সে

দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। এক্ষণ ঐতিহাসিকদিগের নিকট প্রশ্ন এই যে, এই সমগ্র সসাগরা পৃথিবীর কোন একচ্ছত্র রাজা আছেন কিনা। যিনি সম্রাটের সম্রাট্ আমি সেই জগদীশ্বরের কথা বলিতেছি না এবং এ প্রবন্ধে সে নামের উল্লেখ না হওয়াই ভাল। তবে তাঁহার নিম্নে কোন দর্শনস্পর্শনযোগ্য লৌকিক সার্ব্বভৌম আছে কিনা।

আপনারা বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন কেন? এখানে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় কুলাইবে না। দিব্যনেত্রে খুঁজিতে হইবে, সংসারটীকে একটি বদরী ফলের মত এপাশ ওপাশ করিয়া উল্টাইয়া দেখিতে হইবে, তবে বুঝিতে পারিবেন। যখন আপনারা রহস্যভেদ করিতে অক্ষম, তখন আমিই বলিয়া দিই যে, সে রাজা আর কেহই নয়,—সে "টাকা"।

উচ্চহাস্য করিবেন না। ভাবিয়া দেখুন, টাকাতে রাজার সংজ্ঞাটী খাটে কিনা। টাকাইত জগত শাসন করিতেছে। বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে সেই অমলধবল রজতখণ্ডের প্রভুত্ব অপরিসীম। যিনি যাহাই করুন, তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, তাহার অধিকাংশই টাকার আজ্ঞায়। আমরা চাকরি ক'র টাকার আজ্ঞায়, ব্যবসা-বাণিজ্য করি টাকার আজ্ঞায়, স্কুলবুক প্রণয়ন করি টাকার আজ্ঞায় এবং জাল জুয়াচুরি মামলা-মকর্দ্দমা করি টাকার আজ্ঞায়। টাকার রাজ্যে শেষোক্তগুলি অসৎ কার্য্য নহে। কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকার ও বদান্যতা প্রভৃতি কার্য্য অসৎ; কারণ উহা আইন-সঙ্গত নহে।

Adam Smith ও Mill এর গ্রন্থই আইন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিস্তর Politico-Economical ওরফে রাজনৈতিক গ্রন্থেও আইন সন্নিবিষ্ট আছে। আইন না মানিয়া চলিলে রাজার আক্রোশে পড়িবে, টিকিতে পারিবে না। জুয়াচুরি ও জালিয়াতী আইনে উল্লিখিত নাই; বোধ হয় রাজপ্রসাদ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নহে বলিয়া। লটারি ও জুয়াখেলাও আইন-নিষিদ্ধ; যদিও ইহাতে কখন কখন সহসা রাজানুগ্রহ লাভ করা যায়। প্রায়ই সাহসিক পুরুষগণ এই পন্থা অবলম্বন করেন।

টাকা সকল দেশেই মান্য। টাকার ক্ষমতা অস্বীকার করে, টাকাকে পূজা না করে, এমন ব্যক্তি সুদুর্লভ। রাজারাও করিয়া থাকেন। তাহারই আদেশে নৃপতিগণ নিরপেক্ষভাবে জাতিবর্ণ-নির্ব্বশেষে তাঁহাদিগের রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। টাকার ন্যায় ক্ষমতাশালী কে? উহার ভাস্বর সুদর্শন-চক্রে কত নিরপরাধীর মস্তক কচ্ করিয়া কাটিয়া যায়। যাহার উপর টাকার কৃপাদৃষ্টি অল্পমাত্রায় পতিত হয়, তাঁহারই বার পাওয়া দুষ্কর। যাঁহার উপর কিছু অধিক মাত্রায় পতিত হয়, তাঁহার তেজে চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবৃন্দ থরহরি কম্পমান। তাঁহার প্রভাবে কেহ মাথা তুলিতে সাহস করে না, যেমন শুনিতে পাই অরণ্যে হিঙ্গু নামক মহা তেজস্কর ওষধিবৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, অন্য কোন বৃক্ষ তাহার নিকট গজাইতে পারে না। তিনি গাড়ি-জুড়ি-অট্টালিকা-সম্পন্ন। তিনি পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে ষড়াননকেও পরাস্ত করেন ও তাঁহার মস্তিষ্ক ঈষৎ উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি দাস দাসী পাচকদিগকে কখনও কশাঘাত

কখনও ঘুষ্যাঘাত করেন। কিন্তু তাঁহার এমনই চমৎকার আকর্ষণী শক্তি যে, তিনি নিত্য পরিজন-পরিবৃত। সকলেই তাঁহার আত্মীয় হয়, ঊর্দ্ধতম চতুর্দ্দশপুরুষস্থ সম্পর্কসূত্র অবলম্বন করিয়াও নিকটবর্ত্তী হয়। তিনি মধুচক্রের ন্যায় উচ্চশাখায় অবস্থান করেন, পারিষদ-পিপীলিকা কাতারে কাতারে উঠে; তিনি পনস ফলের ন্যায় গৃহমঞ্চে শোভা পাইতে থাকেন, পত্নীপুত্রাদি ফেরুপাল তাহার নিতান্ত অনুগত হইয়া নিম্নে বিচরণ করে। তাঁহার সহাস্য আস্যে সকলের বদন প্রফুল্ল হয়। তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে ভূকীটের ন্যায় সকলেই কুঞ্চিত-কলেবর হইয়া পড়ে। ইহা কি কোন দৈবশক্তি? না ইহা টাকারই শক্তি মাত্র। যেমন ত্রিপথগা গঙ্গা যে যে দেশ দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন, সেই সেই দেশ আপনার পবিত্রতায় পবিত্র করিয়াছেন, সেইরূপ টাকাও যে যে ব্যক্তির করস্পর্শ করিয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তির দেহে টাকার অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে।

আর লোকমনোরঞ্জন করা যদি রাজকর্ত্তব্য হয়, তবে টাকার ন্যায় আর কে আছে? টাকা কাহাকে না প্রীত করে? কোন্ বর্ব্বরের কলুষিত হৃদয় টাকার দর্শন মাত্র যাদুকর-হস্তস্থিত গুটিকার ন্যায় আনন্দে নৃত্য না করে?

হে টাকা! তুমি রাজরাজেশ্বর। তোমার সেবায় চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াও সুখী হওয়া যায় না, অথচ তোমাকে যে করতলগত না করিল তাহার ন্যায় অসুখী কে? তুমি যতই বশীভূত হও, তোমাকে বশ করিবার লিপ্সা ততই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। তাই কবি বলিয়াছেন—"সুসেবিতোঽপি নৃপতিঃ পরিসেবনীয়ঃ"।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার গুণাবলী ও ক্ষমতারই পরিচয় দিলাম, কিন্তু রাজা কিরূপ, এক অথবা বহুসংখ্যক ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজা এক ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা সংখ্যায় বহু, এমন কি অগণিত বলিলেও চলে। রাজবংশ ক্রমশই বাড়িতেছে, কারণ, ক্ষয় অপেক্ষা উৎপত্তি অধিক। ইঁহাদের সকলেরই জন্ম 'মিণ্ট' দেশে। জন্মিয়াই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়েন এবং পরিভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। রাজগোষ্ঠীর সকলেই রাজা বলিয়া অভিহিত এবং পরস্পরের মধ্যে বর্ণ ও আকৃতির পার্থক্য অতি অল্প। তাহাদিগের সকলেই শুভ্র, সকলেই নিটোল বর্ত্তুলাকার এবং সকলেরই অঙ্গ অক্ষরে চিত্রবিচিত্র।

এস্থলে বলিয়া রাখি যে, গিনি, মোহর, পয়সা প্রভৃতি সমস্তই এক হিসাবে টাকা; কেবল রূপান্তরিত। রাজারা কামরূপী, স্বেচ্ছাক্রমে এই সকল মূর্ত্তিও পরিগ্রহণ করেন, এবং সময়ে সময়ে নোট বা চেক্‌রূপে কাগজখণ্ডে পরিণত হন। কিন্তু টাকা বলিলে যে মূর্ত্তি প্রথম মনোমধ্যে উদিত হয় তাহাই রাজার স্বরূপ। কেহ বলেন, উহারা রূপান্তর নহেন, টাকার সহিত উঁহাদের আত্মীয়তা আছে। কার্য্যের সুবিধার জন্ম উঁহাদিগকেও রাজক্ষমতাপন্ন করিয়া বা রাজপ্রতিনিধিরূপে অবতারণা করা হয় এবং টাকার সহিত উঁহাদিগের স্থান বিনিময় চলিয়া থাকে।

কথিত আছে, টাকার জগদ্ব্যাপী রাজত্বের পূর্ব্বে এক পুরাতন অসভ্যজাতি (aborigines) কোন কোন প্রদেশে রাজত্ব করিত।

তাহাদের রাজত্ব এক্ষণ লুপ্ত হইয়াছে, অথবা কোন সুদূর অজ্ঞাত স্থানে আছে কিনা বলিতে পারি না। তাহারা চামড়া ও কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। তাহারাও আপনাদিগকে টাকাবংশীয় বলিত। কিন্তু টাকাবংশ তাহা অস্বীকার করিয়া বলিত যে, "তোমরা নীচবংশজ তোমাদের intrinsic worth নাই, নতুবা তোমরা ক্রমশ অচল হইতেছ কেন?" তাহারাও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা উত্তর দিত যে, "অচল হইতেছি, কদাকার ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া, কিন্তু intrinsic মূল্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই। তোমাদের মূল্যও conventional আমাদের মূল্যও তাই। আর যদি যদিও স্বীকার করি যে, তোমাদের কোন নিজস্ব গৌরব আছে, তথাপি চেক ও প্রমিসারী নোট যদি রাজাখ্যা প্রাপ্ত হয়, তবে আমরাও সে আখ্যা পাইবার যোগ্য। তোমরা পশ্চাতে থাকিলে আমরাও রাজ্য শাসন করিতে পারি। টাকা ব্যতীত নোটের কদর কি? তোমরা সুশাসক, তোমাদের ভরসাতেই লোকে নোটের উপর বীতশ্রদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হয় না।" বাধ্য হইয়া টাকার উত্তর দিতে হইত "কি করিব ভাই, তোমাদিগকে প্রজামণ্ডলী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পরিহার করিতেছে; আমাদের অপরাধ কি?"

কিন্তু উপরোক্ত অসভ্য রাজগণ এক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে ও অতি সামান্য ভাবে কালাতিপাত করিলেও তাহাদের দুই একজন উকিল এখনও নিরস্ত হয় নাই। তাহারা জিদ্ করিয়া বলিবে যে, স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা কোন অংশেই কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তাহারা বলে যে, টাকা ও কাষ্ঠ উভয়েরই মূল্য এক, উভয়েরই Exchangeএর

Medium মাত্র। সুতরাং উভয়েই সাক্ষিগোপাল। রাজা হইবার অধিকার কাহারও নাই।

নিজের মক্কেলের পক্ষে কোন যুক্তি না থাকিলে বিপক্ষকে গালাগালি দেওয়াই ইহাদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম। কিন্তু রাজ-আদালতে দাঁড়াইয়া রাজার বিরুদ্ধে এরূপ বলা ভয়ঙ্কর Sedition। আদালতে সকল মকর্দ্দমার বিচার হইতে পারে, কিন্তু রাজার রাজ্যশাসনে অধিকার আছে কিনা ইহার বিচার সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যাহা হউক, এরূপ কুৎসাকারিদিগের সংখ্যা অতি কম। মোটের উপর প্রায় পোনর আনা সাড়ে তিন পাই মনুষ্য রাজভক্ত। রাজারা বা রাজবংশীয় পুরুষগণ অল্লাধিক সংখ্যায় সকলেরই গৃহে আগমন করেন ও সকলকে কৃতার্থ করেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদস্থ উচ্চ কক্ষে নয়ন নিমীলিত করিয়া প্রজার সুখদুঃখের বিষয়ে স্বপ্ন দেখেন না, বা কাল্পনিক অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত বিরাট্ 'কমিশন' প্রেরণ করেন না। প্রজার গৃহই তাঁহাদের গৃহ, প্রজার অভ্যর্থনাই তাঁহাদের পুরস্কার। তবে অনেক সাধ্যসাধনা ও পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনিতে হয়। যে রাজপদার্পণে গৃহের শোভা ও শ্রী বর্দ্ধিত হয়, গৃহবাসিগণের চক্ষে আনন্দের আলো উছলিয়া উঠে, সে পদার্পণ বড় সস্তার সামগ্রী নহে। আনিলেও, নিরাপদস্থানে অর্থাৎ সিন্দুক-বাক্স সিংহাসনে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়; কারণ "Nihilist" দস্যুগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।

হে টাকা, তুমি যে গৃহে না থাক, সে গৃহ অরণ্যসমান, সে গৃহে কলহ, অশান্তি নিত্য বিরাজমান; সে গৃহ গৃহিণীসত্ত্বেও শূন্য।

তোমার অসদ্ভাবে গৃহিণীও গৃহিণীপনা পরিত্যাগ করিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে দিবারাত্র মুখাগ্নি ও পরলোক-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে থাকেন এবং অভূষণা কন্যা ও অশিক্ষিত পুত্র সেই সুরে সুর চড়াইয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকে। তাই আমার একটি ছড়া মনে পড়ে—

"টাকা! টাকা! টাকা!
ও ভাই, টাকা যার ঘরে নাই
তার দুনিয়াটাই ফাঁকা।"

ইংরাজীতেও এইরূপ টাকার প্রশংসা কীর্ত্তন আছে—

"Money, money, money,
Brighter than sun-shine
Sweeter than honey."

হে টাকা, তুমি গৃহে থাকিলে নীচকুল সহসা উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়, সমাজচ্যুত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি সমাজের নেতা ও অগ্রণী হয়, নিন্দা ও কুৎসা খ্যাতিতে পরিণত হয়। তোমার অনুগ্রহে কত পিত্তলের অলঙ্কার স্বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কত উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ সংগৃহীত হয়, কত ভীষণ অপরাধ মিথ্যা দোষারোপ ও ক্ষতিপূরণে পর্য্যবসিত হয়।

তুমি নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশীর ন্যায় জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতে থাক, আর তোমার সম্মোহনরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমার মানসচকোর নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া থাকুক। হে রাজন্, একবার তোমার অমৃতময় জ্যোৎস্না বিতরণ কর, একবার আমার আঁধার কক্ষগুলি সেই

দিব্যালোকে উদ্ভাসিত কর। আমি নিতান্ত দীনহীন, অন্য প্রার্থনা করি না।

হে টাকা, তোমরা গাছে ফল না কেন? টাকার গাছ থাকিলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার মূলে বসিয়া থাকিতে কিঞ্চিন্মাত্র কষ্টবোধ করিতাম না। মৃত্তিকা খনন করিয়া সার দিতাম, আলবালে জলসেক করিতাম, জাল দিয়া ঘিরিয়া পক্ষিকুল তাড়াইতাম এবং কি না করিতাম? কিছুতেই কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু তাহাতে রাজসম্মান হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে, কারণ যাহা সুলভ তাহা প্রায়ই অনাদৃত হয়। সুতরাং আমি যদি বিধাতা হইতাম তাহা হইলে টাকার বৃক্ষকে অতিশয় উচ্চ, শাখাপ্রশাখাহীন, কণ্টকাকীর্ণ ও সর্পসঙ্কুল করিয়া দিতাম।

হে টাকে, তুমি যথার্থই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী। তুমি আপন চক্রের উপর জগৎসংসার ঘুরাইতেছ। তোমার অনুগ্রহ-ভিক্ষায় লোকে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে, ভিক্ষা করিতেছে, দাসত্ব করিতেছে। হে কমনীয়, হে রমণীয়, হে মোহনীয়, হে চিরবাঞ্ছিত তোমাকে কাহার সহিত তুলনা দিব? তুমি যথার্থই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' অথবা কবির ভাষায় "তোমারি তুলনা তুমি এ মহী-মণ্ডলে।"

কিন্তু হে টাকা, তুমি নাকি ধর্ম্মের সিংহাসন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছ? অন্তত এই ভারতবর্ষের লোক নাকি ধর্ম্মকেই রাজা বলিয়া উপাসনা করিত। তোমার আগমনে সেই বৃদ্ধ রাজা নাকি

মুসলমানের আগমনে লক্ষ্মণসেনের ন্যায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছেন ? * ধরিলাম এ সমস্ত সত্য, কিন্তু প্রজার মন তুমি কি করিয়া বশীভূত করিলে ? বশীভূত করিবার কারণ বোধ হয় এই যে তুমি বড় সুন্দর, বড় মধুর। ধর্ম্ম আশ্বাস দিয়া প্রজার আবেদন পত্রগুলি পরলোকের জন্য নথি করিয়া তুলিয়া রাখিত, কিন্তু তুমি রাজভক্ত প্রজাকে বিপদ ও অসুবিধা হইতে আশু পরিত্রাণ কর। হায়, ধর্ম্মের রাজ্যে বাস করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনে কত কুসংস্কারই হইয়াছিল। তখন তাহারা তোমার বর্দ্ধনশীল আধিপত্যের কথা শুনিল বলিল ত যে "তুমি তাহাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আসিতেছ। তুমি নাকি পাপের সঙ্গী রাক্ষসবিশেষ। তুমি নাকি প্রজার বক্ষের ভিতর আপনার রক্ত-পিপাসু জিহ্বা চালাইয়া দিয়া রক্ত শোষণ কর, যাহা প্রাণের প্রাণ, জীবনের সর্ব্বস্ব সেই উচ্চ বৃত্তিগুলির ধ্বংস কর, ঈশ্বরে ভক্তি কমাইয়া দাও, মানুষে মানুষে সহানুভূতির বন্ধন শ্লথ করিয়া দাও। যে স্থানে তুমি রাজত্ব কর সে স্থানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, বন্ধুতে বন্ধুতে বিচ্ছেদ, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়।" কিন্তু আজ ভারতবাসীও পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের সহিত একসুরে বলিতেছে, "হে টাকা, আমরা পূর্ব্বে তোমার নিন্দা করিয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সেই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। তুমি আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি সাক্ষাৎ কল্কি বা ভগবানের অবতার—

---

* লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ঐতিহাসিক ঘটনা না হইলেও, উপমা দিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আমরা তোমার ভজনা করি। তুমি প্রত্যক্ষ পুণ্য এবং মূর্তিমতী দেবতা—'মহতী দেবতা হ্যেষা টাকারূপেণ তিষ্ঠতি।' আমরা অপর কাহাকেও দেবতা বলিয়া মানিব না। বহু দেবতায় বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমান্ধতার পরিচায়ক। তুমি অখণ্ডমণ্ডলাকার এবং চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছ।✓* তুমি অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করিতে থাক ও আমাদের আন্তরিক পূজা গ্রহণ কর।

ভবানীপুর

২৪শে অগ্রহায়ণ

১৩১৮।

---

† এক একবার আমারই সন্দেহ হয় যে এই অদ্বিতীয় দেবতাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম কিনা। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, টাকাও তাই। টাকাকে সৎ ভিন্ন যে অসৎ বলে তাহার মত মূর্খ আর নাই। টাকাকে দাঁড় করান যায় না সে সর্ব্বদাই চিৎ এবং টাকা আনন্দময় না হইলে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেও সে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিবে কিরূপে?

শঙ্খ।

—:০:—

হে দিবাবসানশংসী, স্নিগ্ধগম্ভীরনাদী, কঙ্কালসার মহাপুরুষ! তুমি যখন তোমার তীব্রকণ্ঠে বায়ুমণ্ডলকে স্তরে স্তরে বিদীর্ণ করিতে করিতে কোন্ ঊর্দ্ধলোকে বিলীন হইয়া যাও, তখন মনে হয়, যেন তোমার সেই স্বরোৎকীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া শান্তির পীযূষধারা—দেবলোকের আশীষবৃষ্টি ও রজনীর সুষুপ্তি-সুধা মর্ত্ত্যধামে ছড়াইয়া পড়ে। তুমি দিগ্বলয় বেষ্টন করিয়া যে এক বিরাট স্বরপরিখা নির্ম্মাণ কর, যেন তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবসের সমস্ত বিক্ষিপ্ত কোলাহল নিঃশেষ হইয়া যায়। আবার কখন মনে হয়, যেন তুমি তোমার একটি বিশাল ফুৎকারে প্রধূমিত দিবালোক-বহ্নিকে পুনরুদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা কর, যেন তাহারই উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ-কণিকা-সমূহ দেখিতে দেখিতে চন্দ্রতারকারূপে গগনাঙ্গনকে সুশোভিত করে এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রতর জ্যোতির্বিন্দুতে দেউলে—দেবালয়ে—সৌধশিরে—রাজপথে ও তটিনী-বক্ষে জ্বলিয়া উঠে।

হে বঙ্গদেশীয় 'কারফিউ'; হে দিনকর-বিদায়-সঙ্গীতোচ্চারী বৈতালিক, হে সন্ধ্যাবাহনকারী ঋত্বিক্, তুমি ইংরাজ-ভজনালয়ের ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় কেবল মন্দিরনিবদ্ধ নও, তুমি আমাদিগের ভবনে ভবনে সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তুলিয়া থাক। তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হিন্দুর গৃহে তিনবার করিয়া ধ্বনিত হইয়া থাক। আমার বোধ হয়,

প্রথমবার তুমি তপনদেবের বিদায়-গীত গাও, দ্বিতীয়বার তাঁহার অস্তাচল-বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কর্ণকুহরে নিদ্রা-সঙ্গীত ঢালিয়া দাও এবং তৃতীয়বার তোমার মঙ্গল-নিঃস্বনে রক্তিমাব-গুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা-বধুকে বরণ করিয়া আমাদের গৃহে আনয়ন কর !

তুমি হিন্দুর প্রতি মাঙ্গলিক ব্যাপারের সহিত একাঙ্গীনভাবে সংশ্লিষ্ট। তুমি উৎসবের প্রচারক, আরতির অঙ্গ, উদ্বাহের সহায় ও হুলুধ্বনির নিত্যসহচর। তুমি মন্দিরের গৌরব, গৃহের শোভা এবং পূর্ব্বে রণক্ষেত্রের বাদিত্রও ছিলে। তখন তুমি কর্ম্মজীবনের দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে যুগপৎ অবস্থিত থাকিতে। কখন তুমি পুরোহিতের শান্ত-পবিত্র করকমলে কখন বা যোদ্ধার রুধিররঞ্জিত বর্ম্মমুষ্টিতে বিরাজমান থাকিতে। সে যুদ্ধও নাই—সে তুরী-ভেরী-দামামাও নাই, সে তুমিও নাই। যে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে বীরকেশরীর হৃদয়ও কি এক অব্যক্ত ত্রাসে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত, যাহার নিকট শিঙ্গার বিকট নিনাদ ও কোমল বলিয়া প্রতীত হইত, যাহার নিকট আধুনিক "বিউগীল"-নামক বংশী একটি ক্ষীণকণ্ঠ অজাতশ্মশ্রু বালক ব্যতীত আর কিছুই নয়, সে শঙ্খ এখন কোথায় ? প্রাচীন বীরত্বের উপর যে জরা আসিয়া পড়িয়াছে, আজ সেই জরায় তুমিও জীর্ণ, আজ তোমার কঙ্কালসার দেহও কঙ্কালসার হইয়াছে।

প্রাচীন যুদ্ধে শঙ্খ যে একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল, এ বিষয়ে কি কেহ সন্দেহ করেন ? যদি করেন, তবে একবার মহাভারতের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখুন। দেখিবেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অন্যান্য অনেক যোদ্ধাই শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

যদি পুরাণ অনুসন্ধান করিতে কষ্ট হয়, তবে ইতিহাসই অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন। আর যদি তাহাতেও কষ্ট হয়, তবে আসুন, আরও সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। কবিবর ৺ মধুসূদন দত্তের কবিতাপুস্তকখানি উল্টাইয়া দেখুন। তাঁহার একটি বাল্য কবিতার প্রথম ছত্রে এইরূপ লেখা আছে—"শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল।"—মশকের সিংহকে এইরূপভাবে আক্রমণ করা অবশ্য অতি প্রাচীন যুগের কথা, এবং কবিও প্রাচীন যুগের পদ্ধতি অনুসারে ? মশককে শঙ্খনাদ করাইয়া, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। কবিবর সে পদ্ধতি জানিতেন না, ইহা বলিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়, সুতরাং জ্যামিতির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে পারি যে, প্রতিজ্ঞাটি সপ্রমাণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রে বলে যে, দুইটি নিকটবর্ত্তী সাময়িক ঘটনা, হয় কার্য্য-কারণভাবে সংশ্লিষ্ট, না হয় দিবারাত্রির ন্যায় নিত্যানুবন্ধি হইয়াও কার্য্য-কারণ-সম্পর্কহীন, না হয় কাকতালীয়বৎ। এক্ষণ, দেখা যায় যে ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হইলেই বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্যান্য অনেক সহরে ও গ্রামে চতুর্দ্দিক হইতেই শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি ? ভূমিকম্প ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে কি প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান ? বোধ করি, ইহা নির্দ্ধারিত করিতে অনেক নৈয়ায়িকেরই ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইবে। প্রথমতঃ, কাকতালীয়বৎ হইলে যখনই ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হয়, তখনই শঙ্খধ্বনি হয় কেন ? দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ

হইলে, শঙ্খধ্বনির পর আবার ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হয় না কেন? অথবা যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনরূপ কারণ স্থগিত হইলে দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন আর আসিবে না, সেইরূপ শঙ্খধ্বনির এমন কি অদৃশ্য কারণ আছে, যাহার অভাব হইলে ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হইবে অথচ শঙ্খধ্বনি হইবে না? আর যদি ঐ দুইটি ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবই বিদ্যমান থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ নিয়ম জগতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না কেন?

সে যাহা হউক, ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাতের অব্যবহিত পরেই যে, শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাহা কি অনির্ব্বচনীয়—কি গভীর ভাবোদ্দীপক! গভীর রজনীতে অবরুদ্ধ নগরীর আর্ত্তনাদের ন্যায়, ঝটিকা-প্রহত সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায়, উহা ভীমবেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইয়া, নিমেষমধ্যেই সুষুপ্তিমগ্না নিশীথিনীর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং নগরবাসিগণকে উৎকর্ণ—উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাতের ক্ষণিক আতঙ্ককে দীর্ঘকাল-স্থায়ী করিতে শঙ্খধ্বনির সমকক্ষ আর কিছুই নাই। নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নে যেরূপ পবনচালিত বহ্নি চিন্তার ন্যায় দ্রুতবেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সংক্রমিত হয়, এই শঙ্খধ্বনিও সেইরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে পরিচালিত হইয়া অবিলম্বেই এক ঘোরতম ঝঙ্কারে কর্ণযুগলকে বধির করিয়া দিবার উপক্রম করে। কেহ কেহ বলেন, শঙ্খধ্বনির ঐ প্রকার উতরোল বড়ই কৌতুকপ্রদ ও শ্রোত্রসুখকর। কিন্তু আমার মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ন্যায়শাস্ত্রের ও সাহিত্যের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণিবিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিষয়টিকে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের সহিত শৃগালের অনেকটা সম্পর্ক আছে। একটি শৃগাল চীৎকার করিলে যেরূপ সকল শৃগাল চীৎকার করে, সেইরূপ একব্যক্তি শঙ্খধ্বনি করিলে, সকলেই শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকেন। মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল এবং সমাজনীতির দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্য সামাজিক জীব বলিয়াই পরস্পরের অনুকরণ করিয়া থাকে।

যদি শঙ্খধ্বনির পৌরাণিক যুক্তি চান, তাহা হইলে তাহাও দিতে পারি। পুরাণে বলে যে, বাসুকির মস্তকের উপর পৃথিবী অবস্থিত; সুতরাং যখন তিনি কোন কারণে মস্তক সঞ্চালন করেন, তখন ভূমিকম্প হইয়া থাকে এবং বজ্রধ্বনির কারণ এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে বজ্র-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তিনি বারিবর্ষণের দেবতা এবং বারি-বর্ষণই তাঁহার উদ্দেশ্য। সুতরাং শঙ্খধ্বনি যদি পৌরাণিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেহেতু সঙ্গীতধ্বনিতে সর্পমাত্রেই মুগ্ধ হয়, অতএব শঙ্খধ্বনি-মুগ্ধ হইয়া বাসুকি তাহার ফণাকে স্থির করিবে এবং দেবরাজ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার বজ্র বড় অধিক জোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মেঘের গাত্র ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে সুতরাং তিনি ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করিবেন।

হে শঙ্খ, তোমার কণ্ঠে যে অপূর্ব্ব স্বর জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হয়, যে স্বরের ভীষণ গাম্ভীর্য্যে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়, সে স্বরের তুলনা আর কোথাও পাই না কেন? আমার বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে, তুমি জীবদ্দশায় সমুদ্রের অনন্তমুখী সুমহান্ কল্লোল-সঙ্গীত শুনিয়াছিলে। সে সঙ্গীত তোমার প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখন মূকতা-নিবন্ধন তাহা তুমি প্রকাশ করিতে পার নাই; এক্ষণ নরের নিশ্বাস-বায়ুতে পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় তোমার সে পূর্ব্বজন্মের মূকতা দূরীভূত হইয়াছে, এখন তুমি তোমার অস্থিনিহিত সাগরসঙ্গীত—যাহা বহুদিন ধরিয়া তোমার পঞ্জরগুলির মধ্যে নিদ্রিত ছিল—তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া, জগতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছ।

কিন্তু নরলোকে আসিয়াও সকল শঙ্খের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না; জলশঙ্খগুলির সেই দশা। তাহারা বোধ হয়, এখনও সেই বিরাট্ অনন্ত-সঙ্গীতের অনুধ্যানে মগ্ন। সে সঙ্গীত যাহার কর্ণে অনুক্ষণ বাজিতেছে, সে চিরদিনই নির্ব্বাক্ থাকিবে, সে চিরদিন মহামৌনী যোগীর ন্যায় সেই ব্রহ্মরূপিণী উদাত্তরাগিণীর উপাসনা করিবে, আপনার ক্ষুদ্র কলরব সে কখনও তুলিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু নরলোকে সবাই বক্তা—সবাই আপনার উচ্চকণ্ঠে অপরের কণ্ঠকে ডুবাইয়া দিতে সচেষ্ট। তাই, নরলোকে আসিয়া কোন কোন শঙ্খের মুখ খুলিয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন শঙ্খকে জলশঙ্খ * বলা হয় কেন? স্থলশঙ্খ

---

* পদ্ম ও শঙ্খকে সর্ব্বত্রই একত্র দেখিতে পাই—

আবার কোন্‌টি? সকল শঙ্খই ত এককালে জলে ছিল। যদি ভিতরে জল ভরিয়া রাখিতে হয় বলিয়া ঐ নামকরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—জল ভরিয়া রাখি কি জন্য? উহার দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়? উত্তর—উহা চিরাগত প্রথা। কিন্তু সে চিরাগত প্রথার মূলে কি কোনই যুক্তি নাই? সকল শঙ্খে জল ভরি না কেন? উত্তর—জলশঙ্খের মুখে ছিদ্র নাই—সে মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকে—তাই তাহার জলটুকু ধরিয়া রাখিবার শক্তি আছে। ওঃ—এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য কি! উহা একটা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড রূপক। যেরূপ "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে"; সেইরূপ রূপকচ্ছলেন ইহার দ্বারা আমাদিগকে একটা মস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইবার রূপকটির ব্যাখ্যা করিব। শঙ্খ মাত্রেই মনুষ্য এবং জল—মন্ত্রণা। যাহার কথা বলিবার শক্তি আছে, তাহার কর্ণে গুপ্তমন্ত্রণা প্রদান করিও না; কি জানি, কোন্‌ দিন তাহার মুখ দিয়া তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। যদি মন্ত্রণা বলিতে হয়, তবে এমন লোকের সম্মুখে বলিও—যে বোবা, যাহার বাক্‌শক্তি নাই, অথবা যে শিশু—

১। নারায়ণের হস্তে শঙ্খও আছে—পদ্মও আছে।

২। স্ত্রীলোকের মধ্যে পদ্মিনীও আছেন—শঙ্খিনীও আছেন।

৩। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে শঙ্খও একটি সংখ্যা—পদ্মও একটি সংখ্যা।

৪। কালিদাসের যক্ষের গৃহদ্বারে শঙ্খও আছে—পদ্মও আছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে স্থলপদ্ম ও জলপদ্মভেদে পদ্ম দুই প্রকার থাকায় সামঞ্জস্যের খাতিরে শঙ্খকেও স্থলশঙ্খ ও জলশঙ্খভেদে দুই প্রকার করা হইয়াছে।

যাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই, অথবা যে মন্ত্রণাটুকু চিরদিন নিজের মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে, কখনও মুখ খুলিয়া অপরের নিকট ব্যক্ত করিবে না।

এক সমস্তার পারে যাইতে না যাইতেই অপর সমস্তা আসিয়া উপস্থিত। "একস্ত দুঃখস্ত ন যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।" শঙ্খকে মাটির উপর রাখিতে নাই কেন? "ছিদ্রেষনর্থা বহুলী ভবন্তি" এটি ঠিক্ কথা। আমাদের বুদ্ধির দ্বারে কোথায় একটি ছিদ্র আছে, যেটা অনেকটা বিকল বেলুনের "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভের" স্থায়। ভিতরের গ্যাস অর্থাৎ জ্ঞান বড় বাহিরে যাইতে না পারিলেও বাহিরের প্রশ্নগুলি মাঝে মাঝে এক একটা ঝড়ের মত হু হু করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ঐ ছিদ্রটুকু আছে বলিয়াই এত গোলমাল। সেই বাহিরের বাতাসটুকুকে লইয়া মহা গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। যতক্ষণ না তাহাকে নিরস্ত করা যায়, ততক্ষণ মনের ভিতর একটা ভয়ঙ্কর উপদ্রব চলিতে থাকে। অবশ্য আমার উপমার শেষাংশ-টুকু বোধ হয় বেলুনের পক্ষে খাটে না; কারণ বেলুনের ভিতরের গ্যাসের চাপ বাহিরের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী; কিন্তু আমাদের ভিতরকার জ্ঞানের চাপটার চেয়ে বাহিরের অজ্ঞানটার চাপই বেশী; তাই সর্ব্বদাই নূতন নূতন বিষয় মনের ভিতর আসিয়া পড়ে, আর সর্ব্বদাই নূতন নূতন প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু যাক্, যে প্রশ্নটা তুলিয়াছি, তাহার উপদ্রব আগে দূর করা যাক্। "শঙ্খকে মাটির উপর রাখা হয় না কেন?" কাষ্ঠের উপর, বা ধাতু-পাত্রের উপর রাখিলে দোষ হয় না, অথচ অনাবৃত মৃত্তিকার উপর রাখিলেই দোষ

হয় কেন? শুনিয়াছি সিমেণ্ট করা মেজের উপর রাখিলেও নাকি দোষ হয়। ইহার অর্থ কি? ভূতলে রাখিলে কি শঙ্খের অনাদর করা হয়? যিনি নির্ব্বিকার—যাঁহার নিকট আদর অনাদর উভয়ই তুল্য—তাঁহার আবার অনাদর কি? তবে কি ইহার মধ্যেও একটা রূপক আছে? আছেই ত, এখন যে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। ইহার রূপকার্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করেন, তা দুই এক দিনের জন্যই হউক, আর নিত্যনৈমিত্তিক রূপেই হউক, তাঁহাকে কখন ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে দিও না। তা তোমার অতিথি ব্যক্তি যদি তোমার কোন সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করিতে না আসেন যদি কেবল তাকের উপর চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকেন. যদি কেবল পূজা-উৎসবে নামিয়া আসিয়া, খানিকটা সোর-গোল ও চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার শয্যাটি ভাল স্থানে দিও, নতুবা বাতগ্রস্ত হইয়া যখন তিনি কোঁ কোঁ করিতে থাকিবেন, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে তোমাকেই ডাক্তার ডাকিতে হইবে, অথচ অপযশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে শঙ্খ, তুমি চিরদিনই ঐশ্বর্য্যসূচক। তুমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোন মহামূল্য সামগ্রী ছিলে। জানি না, তোমার ভিতর কি অপূর্ব্ব রত্ন নিহিত থাকিত, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, মুক্তাগর্ভ শুক্তি অপেক্ষাও তোমার মর্য্যাদা অধিক ছিল। মেঘদূতের যক্ষ আপনার গৃহদ্বার পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নিত বলিয়া মেঘের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইলিয়াড্-বর্ণিত "ডেমিগড্"-

দিগের ন্যায় আমাদের যক্ষেরাও দেবতা ও মনুষ্যের মাঝামাঝি ছিলেন; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর প্রভৃতি তাঁহাদিগের ন্যায় আরও কয়েকটি জাতি ছিল সত্য, কিন্তু যক্ষের ন্যায় ধনশালী কোনটিই ছিল না। তাঁহারা বোধহয়, বাঙ্গালা দেশের স্বর্ণ-বণিকদিগের ন্যায় ছিলেন; তাঁহাদিগের রথ্‌চাইল্ড কুবেরের নাম কে না শুনিয়াছেন? দেবতারা তাঁহার নিকট হইতে বিনা হ্যাণ্ডনোটে বা বন্ধকী খতে মাঝে মাঝে কোটী কোটী টাকা ধার লইতেন, এরূপ প্রমাণ পুরাণেও পাওয়া যায়। আজ কত শতাব্দী হইল, সে যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্বেরা "মিথে" পরিণত হইয়াছেন; কিন্তু এখনও "যকের ধন" প্রবাদটি রহিয়া গিয়াছে। এহেন ধনসম্পন্ন যক্ষ জাতির মধ্যে কালিদাসের যক্ষ বড় একটা নগণ্য ছিলেন না। তাঁহার বাড়ীর বর্ণনাটা শুনিলে, এত বড় তাজমহলটাকেও একটা ক্রীড়নক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বাটীর তোরণদ্বারের উত্তর পার্শ্বে মর্ম্মরফলকে পদ্ম ও শঙ্খ-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, ইহার অর্থ কি? পদ্মচিহ্ন যে ঐশ্বর্য্যসূচক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ লক্ষ্মী কমলালয়া; কিন্তু শঙ্খ-চিহ্নের অর্থ কি? শঙ্খও নিশ্চয় লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্য-সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারি যে, এখনও লক্ষ্মীদেবীর চিত্রে শঙ্খ ও শঙ্খ-জাতীয় জীবের কঙ্কালগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বোধহয়, অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও শঙ্খরহস্যের কতকটা সমাধান হইতে পারে। শঙ্খ একটি প্রকাণ্ড সংখ্যা-বিশেষ। উহা কোটী অর্ব্বুদ অপেক্ষাও অধিক। আমার মনে হয়, একটি

সুলক্ষণসম্পন্ন শঙ্খের মূল্য তৎকালে কোটি কোটি মুদ্রারও অধিক ছিল। হয়ত অনেকের ধারণা ছিল যে, ঐরূপ ক্ষণজন্মা শঙ্খ যাহার বাটীতে থাকে, তাহার বাটীতে লক্ষ্মী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন।*

শঙ্খের বিষয় যতই ভাবিয়া দেখি, ততই তাহাকে মহাত্মা বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা দধীচি যেরূপ দেবলোকের হিতার্থ আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন, শঙ্খও সেইরূপ নরলোকের হিতার্থ আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছে। কারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, শঙ্খধ্বনি দ্বারা মনুষ্যের প্রধান শত্রু যে ব্যাধি-বীজাণু, তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু হে অর্ণবচারি, তোমার করাত কি ভীষণ! শুনিতে পাই, তাহা দ্বারা নাকি তুমি জাহাজের তলদেশ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতে পার; আবার সে করাতের দুই দিকের দাঁতগুলি নাকি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাহাতে আসিতেও কাটে যাইতেও কাটে। এইজন্যই কি আমরা দুষ্টা স্ত্রীলোককে শঙ্খিনী নামে অভিহিত করি? শঙ্খ শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'ইনি' ও 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিয়া যদি শঙ্খিনী শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে শঙ্খের সহিত শঙ্খিনী রমণীর আর অন্য কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে? শঙ্খিনী রমণী আপনার করাতের সাহায্যে উভয় কূলই বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। একদিকে যেমন তিনি পিতৃকুলে গিয়া তিরস্কার-করাতে ভ্রাতৃজায়াদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন, অপর দিকে সেইরূপ পতিকুলে আসিয়া মন্ত্রণা-করাতে

* দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এখনও মহামূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সহোদরদিগের সহিত পতির ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন বিদীর্ণ করেন এবং এক দিকে যেরূপ পতিগৃহে আসিয়া অভিমান-করাতের সাহায্যে দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে নেকলেসাদি আদায় করিয়া থাকেন, অপরদিকে সেইরূপ পিতৃগৃহে গিয়া মিষ্টবাক্যরূপ করাতের সাহায্যে বিধবা মাতার যা দু-দশ টাকা সম্বল থাকে, তাহাও হস্তগত করেন।

কিন্তু শঙ্খিনী রমণী কেবল শঙ্খের করাতটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অন্যান্য যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ আছে, তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শঙ্খ গৃহে থাকিলে, লক্ষ্মী অচঞ্চলা থাকেন, আর শঙ্খিনী গৃহে আসিলে, তিনি অন্তর্হিতা হন; শঙ্খ অমঙ্গল দূর করেন, শঙ্খিনী তাহাকে আনয়ন করেন; শঙ্খ শান্তির প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্খিনী অশান্তির বীজ বপন করেন; শঙ্খ ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা করেন, শঙ্খিনী তাহার অন্তরায় হন।

হে শঙ্খ! তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী এ জগতে আর কে আছে? তুমি নারায়ণের পাণিমুষ্টিতে এবং কমলার চরণ-নিম্নে বিদ্যমান এবং সুলক্ষণা রমণীর রক্তিম করতলেও চিহ্নরূপে বিরাজিত। শুধু তাই নয়, তুমি সুন্দরী রমণীর গ্রীবারও উপমাস্থল। যাঁহাদের পদনখরের তুলনায় চন্দ্রও গৌরবান্বিত, তাঁহাদের অমলধবল গ্রীবাও তোমার শোভার অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার তাঁহাদিগের রতন-বলয়াদিশোভিত প্রকোষ্ঠেও তোমার স্থান। শঙ্খবলয় হাতে না থাকিলে সধবা হিন্দু ললনার সকল শ্রীই অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ইহাও তোমার সৌভাগ্যের শেষ সীমা নয়,—কারণ, যখন তাঁহারা তোমার মুখে আপনাদিগের বিম্বাধর সংস্থাপিত করিয়া জলমগ্না

রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকেন, তখন যথার্থই মনে হয়—যে মরিয়া যদি পুনর্জন্ম থাকে, তবে যেন শঙ্খ-জন্ম পরিগ্রহ করি।

পরাজয়।

—ঃ০ঃ—

একদা যখন শয়ন-কক্ষে ছিলাম ঘুমায়ে মুদিত চক্ষে
প্রেয়সী আমার আসি অলক্ষ্যে
বসিয়া পার্শ্ব-দেশে,
কপট নিদ্রা ভাবি মনে মনে টানিল গুম্ফ অতীব সঘনে
দূর ক'রে দিল সতিনী স্বপনে
যেন গো ধরিয়া কেশে।

এরূপে তন্দ্রা ছুটিলে আমার, ভাবিলাম আজ মানিব না হার,
কিছুতেই আঁখি মেলিব না আর,
করিব ঘুমেরি ভাণ;
প্রেয়সীও মোর বিষম দুষ্ট বুঝি মনোভাব হইল রুষ্ট,
মস্তকে তার ত্বরায় পুষ্ট
হইল বহু বিধান।

শিয়রেতে মোর নস্যের দানি থাকিত (কারণ যদি বা কি জানি
লাগে রজনীতে) তারি এতখানি
দিল সে নাসিকা গর্ত্তে,
পরিচিত নাকে নস্যের বোধ হ'লেই ত্বরায় নিশ্বাস রোধ
করি কিছুকাল, ভাবিলাম শোধ
নাহি কি ইহার মর্ত্তে?

হেন মনে ভাবি নিদ্রার ছলে ফেলিলাম শ্বাস অতিশয় বলে,
যাহাতে প্রিয়ার আঁখি দুটী জলে
ভরাইল সেই চূর্ণ,
তাহাতে রমণী-কুলাবতংসা মনে মনে মোরে করি প্রশংসা
হইল যেন গো আরো নৃশংসা
কুটিল কুভাবে পূর্ণ।

মৃদু সড়্‌সড়ি দিল সে অঙ্গে অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে রঙ্গে,
এইবার বুঝি তাহার সঙ্গে
যুঝিতে পারি না আর,
কিন্তু এমনি বরাতের জোর যদিও শরীর শিহরিল মোর
ভাঙ্গিল না তবু নিদ্রার ঘোর
বিপদে হইনু পার।

ইহাতে সে আরো হইয়া ক্রুদ্ধ দারুণ গ্রীষ্মে করিল রুদ্ধ
গৃহের দরজা জানালা শুদ্ধ
বাহিরিল দেহে ঘর্ম্ম,
কি করি তথাপি নাহিক উপায় ব্যজন-চালন করা নাহি যায়,
কিন্তু যে জন জাগিয়া ঘুমায়
না পারে সে কোন কর্ম্ম?

ভাবিলাম মনে প্রিয়ার গাত্র নহে কিছু আর তুষার-পাত্র,
এ ক্লেশ তো নহে আমারি মাত্র,
আমারি তবে কি দায় ;
ক্ষণপরে দেখি নিজেই প্রেয়সী বায়ু-চলাচল ভাবিয়া শ্রেয়সী
খুলিল দুয়ার, এবারও যে অসি
তাহারি ভাঙ্গিল হায় !

পুলকেতে মোর নাচিল হৃদয় ভাবিলাম, আজ বিধি কি সদয়,
ওয়াটারলু রণ করি যেন জয়
হরষে উঠিনু মাতি ;
কিন্তু তখনি বুঝিলাম বেশ প্রেয়সীর রণ হয় নাই শেষ,
যেহেতু তখনি করিল প্রবেশ
মশারিতে নানা জাতি

বিকট নিনাদে বাহিরের মশা , কি করি তথাপি নাহি যায় বসা
ভেবে দেখ মোর সে কি দুর্দ্দশা,
প্রেয়সী বসিয়া পাশে
বসনে ঢাকিয়া আপন পৃষ্ঠ নিজ কৌশলে অতীব হৃষ্ট
নেহারি আমার সে দুরাদৃষ্ট
খিল্ খিল্ করি হাসে।

ঘুমের ঝুলেতে করি ছট্‌ফট্‌ জুড়িলাম তবে লাথি চট্‌পট্‌,
সহিতে না পারি সে ভীম দাপট
ত্যজিয়া মোর পালঙ্ক
নামিল সে ভূমে, ক্ষণপরে আসি নিকটে, যেন গো মনোদুঃখে ভাসি
কহিল কাতরে "আজি তব দাসী
কিনেছে বড় কলঙ্ক।

"বুঝি নাই আগে নির্ব্বোধ আমি প্রকৃতই তুমি ঘুমায়েছ স্বামি
হে জীবন-নাথ আজি সারাযামি
কাটাইব অনুতাপে ;
"ঘুমেতে কাতর না হ'লে কি কভু এত জ্বালাতনে জাগিতে না প্রভু,
তুমি তো জাননা সে সকল, তবু
আমি জ্বলে মরি পাপে।

জেগে আছ ভেবে কৌতুকে কত দিয়াছি যাতনা নিঠুরের মত
ক্ষমা কর সেই অপরাধ শত
করিয়াছি দোষ লক্ষ।"
এত বলি স্নেহ-সুশীতল করে বুলাইল মোর অঙ্গ-নিকরে
সহসা তাহার অশ্রু-শীকরে
ভিজিল আমার বক্ষ।

একি এ চাতুরী ? কখনই নয় এত স্বাভাবিক নহে অভিনয়,
এত অনুতাপ এতটা বিনয়
ছলনা কি হ'তে পারে ?
হেন মনে করি অনুরাগ ভরে বক্ষে তাহারে চাপিয়া সাদরে
মুছানু নয়ন আপনার করে,
কহিলাম শেষে তারে—

"জেগে আছি আমি, কেন অকারণ হৃদয়ে বেদনা করিছ ধারণ
আজি মোর সনে করেছ যা রণ
তুষ্ট হ'য়েছি তাতে,
"জয় পরাজয় সকলেরি হয়" বলিয়াছি সবে,—এমন সময়
হাসিল প্রেয়সী, একি বিস্ময়
করতালি দিয়া হাতে !

আর সেত নয় সাধারণ হাসি— যেন সে ফোয়ারা হ'তে জলরাশি
উঠিল সজোরে উর্দ্ধে উছাসি,
আমি ত অবাক্ দেখে ;
"কি হয়েছে ?" মোর কথা কেবা শোনে হাসিতে লাগিল সে আপন মনে
দেখা দিল জল নয়নের কোণে
কতবার থেকে থেকে।

তবুও সে হাসি লাগিল চলিতে, কি কারণ হাসে পারে না বলিতে
দেখিয়া শরীর লাগিল জ্বলিতে,
ভাবিলাম এ কি কাণ্ড !
হ'লো কি পাগল, অথবা মত্ত অথবা এ হাসি পিশাচ-দত্ত ?
এমন সময় প্রকৃত তত্ত্ব
ভরি মস্তক ভাণ্ড

উঠিল আমার ; বুঝিলাম সব, বুঝিলাম মোর ঘোর পরাভব
কাজেই তখন রহিনু নীরব
লজ্জা মুখেতে মাখি।
কিছুকাল পরে হইল ক্ষান্ত প্রিয়ার সে হাসি, হ'য়ে প্রশান্ত
কহিল সে—"তবে হে মোর কান্ত
জাগিবেনা তুমি নাকি ?

"হয়েছিলে বড় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কহিবেনা কথা, কোথা সে বিজ্ঞ
আচরণ তব, এ অনভিজ্ঞ
হারিলে নারীর কাছে ?"
কহিলাম আমি হাস্য বদনে— "কিসে বল সখি পারি তব সনে
হারাইব তোমা চতুরতা-রণে
কি মোর শকতি আছে ?"

অলঙ্কার।

—:০:—

আমি বৈয়াকরণ নহি, স্বর্ণকার নহি, রমণীও নহি, সুতরাং অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার আমার আদৌ অধিকার আছে কি না তাহাই প্রথম প্রতিপাদ্য। অলঙ্কারের প্রয়োগ, নির্ম্মাণ বা ব্যবহার না করিলেই যে তাহাতে অধিকার জন্মে না ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কোন্ অলঙ্কার কিরূপ, তাহার গঠনে কি কি বৈচিত্র্য আছে, তাহার সহিত অন্য কোন্ অলঙ্কারের ঠিক কতটুকু সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি দুরূহ বিষয়ের নিরাকরণ করিতে না পারিলেও আমাকে যে অলঙ্কার লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে হয় তাহা নিশ্চিত। তা ছাড়া অলঙ্কারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিতে গেলে আমিও কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার বেশভূষাই আমার অলঙ্কার। আর যদি অলঙ্কারকে তাহার সাধারণ সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও আমি নিরলঙ্কার হই না। আমিও কখন সুবর্ণাঙ্গুরীয়, কখন সুবর্ণের বোতাম, কখন সুবর্ণদণ্ডসংলগ্ন কাচযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি এস্থলে সাধারণ পুরুষজাতির প্রতিরূপক, সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন যুগে এই ভারতবর্ষেই আমি অঙ্গদ, কুণ্ডল, প্রভৃতি ধারণ করিয়া আসিয়াছি।

আমার নিজের রুচি অনুসারে আমার দেবতাকেও কেয়ূরবান্, কনককুণ্ডলবান্, কিরীটী, হারী করিয়াছি এবং এখনও আমি উৎকলবাসিরূপে কটিদেশে চন্দ্রহার ও রাজপুতরূপে প্রকোষ্ঠদেশে বলয় ধারণ করিয়া থাকি। তা ছাড়া হার যে, আমরা একটি কবিপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার তাহা "যূনামঙ্গেষু হারাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সাহিত্য-দর্পণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন।

তবে চিরদিনই রমণীর তুলনায় পুরুষের অলঙ্কার ব্যবহার স্বল্প ও ক্ষণিক। রমণীর অলঙ্কার-ব্যবহার বহুল, নিত্য ও চিরপ্রসিদ্ধ। রমণী যেরূপ অলঙ্কার দিয়া কথা বলিতে পারেন, আমাদের কবি ও বৈয়াকরণও সেরূপ পারেন কি না সন্দেহ, রমণী যেরূপ অলঙ্কার ভালবাসেন ও তাহার গঠনতাৎপর্য্য বুঝেন স্বর্ণকারও বোধ হয় সেরূপ ভালবাসেন না বা বুঝেন না এবং রমণী যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, কোন পুরুষই সেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতে সাহসী হন না। অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান স্বাভাবিক ও সংস্কারগত, আমাদিগের জ্ঞান তাঁহাদিগের আনুগত্যের ফল। তাঁহাদিগের আলঙ্কারিক জ্ঞান লোভমূলক ও ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদিগের আলঙ্কারিক জ্ঞান ভীতিমূলক ও ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যেরূপ ভাবেই তাহা উৎপন্ন হউক এবং যতই তাহা অসম্পূর্ণ হউক না কেন, আমাদিগের যে অলঙ্কার সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আছে তাহা নিশ্চিত। সুতরাং অলঙ্কার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আমার অধিকারের বহির্ভূত নহে।

জগতের সকল যুগে ও সকল দেশেই রমণী পুরুষাপেক্ষা অলঙ্কারের অধিক পক্ষপাতিনী। ইহার কারণ কি? রমণী বলিলেন "আমাদের কিছু সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই আমরা তাহার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করি; তোমাদের কিছুই সৌন্দর্য্য নাই, তোমরা কিসের উৎকর্ষসাধন করিবে? যাহার কণ্ঠের স্বর স্বভাবতই মধুর সেই সঙ্গীত শিক্ষা করে, যাহার কিছু সম্মান আছে সেই সম্মান রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত।"

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পুরুষের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রমণীর অনেক স্বীকারোক্তি এখনও লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সকল স্বীকারোক্তি অলঙ্কার প্রদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহে বলিয়া ইহাই অনুমেয় যে, রমণী পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যহীন এবং সেই নিমিত্ত অলঙ্কার ধারণে এত অধিক মনোযোগিনী। 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্' এ কথাটি বড়ই সত্য। একটি উদাহরণ দিলে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যতদিন দেহের সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন থাকে ততদিন রমণী যেরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করেন, দেহের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে তদপেক্ষা অধিক ব্যবহার করেন, অর্থাৎ ভূষণ-সাহায্যে নষ্ট-সৌন্দর্য্যের যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সুতরাং এই সত্যানুসারে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষভাগ রমণীভাগ হইতে সুন্দরতর বলিয়াই রমণীভাগ কৃত্রিম উপায়ে ঋণকৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

রমণীর অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের আরও দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, জগতের সর্ব্বত্র সকল সমাজেই রমণীকে অল্পাধিক মাত্রায় পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাহার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। কিন্তু রমণী আপনার মানসিক গুণের দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে ততটা সমর্থ হইবে না বুঝিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য-সাধনে যত্নবতী। দ্বিতীয়তঃ, রমণীর কর্ম্মজীবন পুরুষের কর্ম্মজীবন অপেক্ষা অপ্রশস্ত; সুতরাং পুরুষদিগের অপেক্ষা অলঙ্কার-পারিপাট্যে সময়ক্ষেপ করিবার তাঁহাদিগের অবসরও অধিক।

এক্ষণ দেখা যাউক অলঙ্কার জিনিষটা কি? যাহা দ্বারা কোন বস্তুকে সুশোভিত করা যায় অর্থাৎ যাহা দ্বারা একটি বস্তু স্বভাবতঃ যত সুন্দর তদপেক্ষা অধিক সুন্দর করা যায় তাহাই অলঙ্কার। যাহা আছে তাহা অলঙ্কার নয়, যাহা আহরণ করা অসম্ভব তাহাও অলঙ্কার নয়। কেশ-বেশও মনুষ্য-দেহের অলঙ্কার,—কিন্তু হস্ত-পদাদি নয়। বৃক্ষের অলঙ্কার পুষ্প, কারণ সকল সময় বৃক্ষে পুষ্প থাকে না, এবং পুষ্পিত বৃক্ষের সৌন্দর্য্য পুষ্পহীন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক। এইরূপ, নদীর অলঙ্কার জ্যোৎস্না, মেঘের অলঙ্কার বিদ্যুৎ, আকাশের অলঙ্কার তারকা—কিন্তু পৃথিবীর অলঙ্কার তারকা নয়, কারণ তারকা পৃথিবীর উপর ফুটিতে পারে না।

প্রকৃতি আপনার রাজ্যের সকল বস্তুকেই অল্পাধিক অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া থাকেন কিন্তু মনুষ্য আপনার স্বকৃত বস্তুগুলিকে

সেরূপভাবে অলঙ্কৃত করিতে শিখে নাই। আমরা প্রাসাদকে কারুকার্য্য দ্বারা, কক্ষাভ্যন্তরকে চিত্র দ্বারা, ভাষাকে অনুপ্রাসাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকি বটে কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বস্তুই অনলঙ্কৃত আছে। আমাদিগের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি যদি সেইরূপ প্রখর ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সেইরূপ সুসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদিগের নির্ম্মিত, রচিত ও উদ্ভাবিত অনেক বস্তু অতি নীরস গদ্যের ন্যায় ভয়াবহ হইত না, তাহা হইলে বোধ করি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয় এত বিষণ্ণ ও নেত্র ব্যথিত হইত না এবং জীবন-যাত্রা অনেক অধিক পরিমাণে প্রীতিপ্রদ হইত।

আমাদিগের আর এক দোষ এই যে, আমরা অনেক অলঙ্কারকে অলঙ্কার নামেই অভিহিত করি না। যাহা ভাষার ও দেহের শ্রী সম্পাদন করে কেবল তাহাদিগকেই আমরা অলঙ্কার বলি, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণকে মনের অলঙ্কার বলি না, ফল, পুষ্প, পক্ষী ও নবকিসলয়কে বৃক্ষের অলঙ্কার বলি না, সোপান, কমল ও বৃহৎ মৎস্যকে সরোবরের অলঙ্কার বলি না। শুধু কি তাই, হারকে কণ্ঠের অলঙ্কার বলিলেও সুস্বরকে কণ্ঠের অলঙ্কার বলি না। যাহা সুন্দর করে তাহাই যদি অলঙ্কার হয় তবে কেবল দৃশ্য বস্তুই অলঙ্কার হইবে কেন? শ্রবণযোগ্য, দর্শনযোগ্য বা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? আমরা কি সুন্দর গন্ধ, সুন্দর রস, সুন্দর স্পর্শ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি না? যদি আমি কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে আমার মুখমণ্ডলকে কমলসুরভি করিতে

পারি বা ঐরূপ কোন উপায়ে আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগে শর্করার মিষ্টত্ব আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সুগন্ধ ও সেই মিষ্টত্ব কি আমার দেহের অলঙ্কার হইবে না ?

যে অলঙ্কার ভাষায় ব্যবহৃত হয় সে অলঙ্কার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সে সব অলঙ্কারের মধ্যে কোন কোনটিতে কেবল অর্থের শ্রাদ্ধ হয় বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে অর্থালঙ্কার বলে এবং কোন কোনটিতে ধ্বনির তুলনায় অর্থ প্রায় থাকে না বলিয়াই তাহাদিগকে বোধ হয় ধ্বন্যলঙ্কার বা শব্দালঙ্কার বলে। অনুপ্রাস একটি ধ্বন্যলঙ্কার, উহা রূপার শিঞ্জিনীর মত 'রিণি ঝিনি' করিয়া বাজে বটে কিন্তু অলঙ্কার হিসাবে উহার মূল্য বড়ই কম এবং ভাব না থাকিলে সে 'রিণি ঝিনিতে' মন বড় ভোলে না ; তবে কোন তরুণবয়স্ক ভাবুকের পক্ষে যদি সে ধ্বনির মধ্য হইতে স্বতই কোন ভাব নির্গত হয়, তাহা বলিতে পারি না। তা ছাড়া প্রতি চরণে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বড় ভালও শুনায় না। তখন 'রিণি ঝিনি'র পরিবর্ত্তে 'ঝমর ঝমাৎ ঝম্'ই বোধ হয় কর্ণে বেশী বাজে। উপমালঙ্কার একটি অর্থালঙ্কার, উহা মুক্তাহারের মত ধ্বনিশূন্য বটে কিন্তু অতিশয় মূল্যবান্ ও প্রভাযুক্ত। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ না করিয়া একেবারেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। আবার কোন কোন অলঙ্কারে অর্থ ও ধ্বনি উভয়ই আছে বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে ধ্বন্যর্থালঙ্কার কহে। যমকালঙ্কার একটি ঐ শ্রেণীর অলঙ্কার। উহা সোনার চুড়ীর মত মূল্যবানও বটে এবং মাঝে মাঝে হৃদয়াপহারি 'টিং টাং' শব্দও করিয়া থাকে। বুড়া

নাপিত।

কপিলও তাঁহার সাংখ্য-সূত্রে 'কুমারী-কঙ্কণবৎ' উদাহরণটি দিয়া সেই'টি টিং'এর মাধুর্য্যোপলব্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

যে অলঙ্কার মনুষ্যদেহে প্রযুক্ত হয় এক্ষণ তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। অলঙ্কার সাধারণ নাম। সামান্য সামান্য অর্থভেদে উহা আভরণ, ভূষণ ও প্রসাধনের বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে। অলঙ্কারের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার প্রত্যেকটির নামোল্লেখ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ পুরাতন ও প্রচলিত সকল অলঙ্কারের নাম করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। তবে অলঙ্কার প্রধানত যে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত তাহাই সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ—দেহের দৈহিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) সমগ্র দেহের অনায়াসসাধ্য অলঙ্কার, যৌবন, যাহাকে কালিদাস "অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেঃ বলিয়াছেন।

(২) দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের অলঙ্কার যথা—রমণীর কেশ। সুদীর্ঘ বিস্রস্ত কেশ-কলাপই একটি সুন্দর অলঙ্কার, নচেৎ পার্ব্বতীর আলুলায়িত কেশপাশ দেখিয়া চমরীরা আপনাদিগের পুচ্ছের প্রতি শিথিল-স্নেহ হইত না।

তার পর ক্রমোন্নতির পর্য্যায়ে চূর্ণালক, বেণী, কুন্তল প্রভৃতি সমস্তই এক একটি সুন্দর অলঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ—দেহের বহির্জাগতিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) দেহের বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক অলঙ্কার, যথা অলক্ত, অঞ্জন, চন্দন, কুঙ্কুম, হরিদ্রা ভস্ম, লোধ্র পুষ্পের পরাগ, রুজ, পাউডার, লাক্ষা, তানাখা প্রভৃতি।

প্রচীন কালে চন্দন দ্বারা রমণীরা বক্ষস্থল ও পুরুষেরা প্রকোষ্ঠদেশ অনুলিপ্ত করিতেন। "ন লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে" এবং "ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে" প্রভৃতি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

(২) দেহের চিত্রবৈচিত্র্যবিধায়ক অলঙ্কার যথা' অলকাতিলকা, পত্রলেখা, ত্রিপুণ্ড্রক ও দেহলেখা (উল্কি)।

পত্রলেখা একটি প্রাচীন অলঙ্কার। কালিদাসের কবিতায় অনেক স্থলেই ইহার উল্লেখ আছে। "ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে স্বনামচিহ্নং নিচখান শায়কম্" এবং "গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত পত্রলেখম্" প্রভৃতি শ্লোক ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন।

(৩) প্রাণিদেহজ অলঙ্কার যথা—অস্থি, পশুলোম্, পশুচর্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতি।

এই অলঙ্কারগুলি প্রকারভেদে অসভ্য ও সুসভ্য উভয় সমাজেই প্রচলিত।

(৪) উদ্ভিদ্দেহজ অলঙ্কার যথা—পত্র ও পুষ্প।

পুষ্পের ন্যায় সুন্দর বস্তু জগতে অতি অল্পই আছে বলিয়া প্রাচীন যুগ হইতেই ইহার এত সমাদর। বিলাসীর পক্ষে এরূপ অলঙ্কার আর নাই। তাই কালিদাস তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্য্য-রাজ্য অলকার আদর্শ সুন্দরী যক্ষ বধূদিগকে এইরূপভাবে সাজাইয়াছেন—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু-কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাং!"

পুষ্পালঙ্কারের নিকট স্বর্ণমুক্তাহীরকাদিখচিত অলঙ্কারও যে নিকৃষ্ট—তাহাও কালিদাস পার্ব্বতীর অঙ্গে নিম্নলিখিত অলঙ্কার দিয়া সূচিত করিয়াছেন :—

"অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী।"

(৫) সুবর্ণ-রজত-মণি-মুক্তাদি-নির্ম্মিত অলঙ্কার।

(৬) বস্ত্রালঙ্কার বা বেশ।

উপরে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারের কথা বলা হইল তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ সাময়িক স্তরে, কোন্ সভ্যতার যুগে ক্রমোদ্ভূত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চয় যে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অলঙ্করণেচ্ছা বাহ্য প্রকৃতি দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম উদ্বোধিত হয়। একদিকে যেমন বহির্জগতে অতুলনীয় শোভা দ্বারা মনুষ্যের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, অপর দিকে সে তেমনি নিজের দীনতা অনুভব করিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যকে অপহরণ করিবার ও সেই অপহৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিবার পরিকল্পনা করিতে লাগিল। ঐ যে আপেলটি ঝুলিতেছে, ঐ যে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া রহিয়াছে, ঐ যে ময়ূর তাহার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ বিস্তার করিয়াছে, ইহাদিগের কোনটি না সুন্দর? ইহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারিলে বুঝি আমিও ঐরূপ সুন্দর দেখাইব, এইরূপ সে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোন্ সুন্দর বস্তুটিকে অগ্রে আত্মসাৎ করিবে? যেটি তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্থাৎ যেটি আহরণ করিতে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সে দেখিল পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়ে, ময়ূর তাহার বর্হ পরিত্যাগ করিয়া যায়, নানা বর্ণের মৃত পতঙ্গ ও প্রস্তরাদি ভূমি হইতেই কুড়াইয়া লওয়া যায়। সে প্রথমতঃ সেই সমস্ত লইয়া আপনার দেহ অলঙ্কৃত করিতে লাগিল; কারণ যত অল্প ক্লেশস্বীকারে যত অধিক তৃপ্তি বা সুখ অর্জ্জন করা যায় তাহাই আমাদিগের বাঞ্ছনীয়—এই মূল সূত্রটি অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির পক্ষে যেরূপ সত্য, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ। তবে

মনুষ্য অল্প ক্লেশস্বীকারে যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিবার জন্য তদধিক ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত,—যদি ক্লেশ অপেক্ষা তৃপ্তির পরিমাণ অধিক হয়। এই নিমিত্ত মনুষ্য ক্রমশ প্রকৃতি-রাজ্যের দুরধিগম্য প্রদেশসমূহ হইতে অতিমাত্র ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল সংগ্রহ করিতেছে যেরূপ হীরক, মুক্তা ইত্যাদি; এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারিত না, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য তদপেক্ষা অনেক অল্প ক্লেশস্বীকার করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেছে।

যাহা হউক, কিছুকাল প্রাকৃতিক বস্তুকে অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিতে করিতেই মনুষ্য ঐ সকল বস্তুর অনুকরণে কৃত্রিম অলঙ্কার সকলও নির্ম্মাণ করিতে শিখিল এবং আজকাল আমাদের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—যেমন তারাহার, বৃশ্চিক হার, কার্পেটের জুতা, লেস্ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতিরাজ্য হইতে গৃহীত বা প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণে নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের দেহের কোন কোন অংশকে ঐ সকল অলঙ্কার ধারণের উপযোগী করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত ওঁরাও, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা অলঙ্কার ধারণের জন্য এরূপ ভীষণভাবে কর্ণভেদ ও নাসিকাভেদ করিয়া থাকে যে, তাহা দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে আশ্চর্য্য হইবার

কিছুই নাই, কারণ ঐ সকল স্থলেও ক্লেশ স্বীকার অপেক্ষা তৃপ্তি লাভের পরিমাণ অধিক। সুসভ্য সমাজেও অলঙ্কারধারণের নিমিত্ত ক্লেশস্বীকারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের বিরুদ্ধ অনুপাতে। হিন্দুস্থানী রমণীরা এখনও যেরূপ পৈঁরী ধারণ করিয়া থাকেন, সেরূপ একখানি অলঙ্কার যদি কোন বঙ্গ ললনাকে ধারণ করিতে হয়, তবে তিনি বরং উদূখল ধারণ করিবেন, তথাপি অলঙ্কার ধারণ করিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের দেহেরও কোন কোন অংশের উন্নতিসাধন দ্বারা তাহাদিগকে অলঙ্কাররূপে পরিণত করা আবশ্যক, এবং সেই সকল শারীরিক অলঙ্কার ব্যতীত বাহ্যিক অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকসিত হয় না। রমণীর কবরী তাহার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সূচ্যগ্র কেশের উপর গোলাপ ফুল সন্নিবেশিত করা অপেক্ষা রমণীর কবরীতে সন্নিবেশিত করিলে তাহা যে অনেক অধিক সুন্দর দেখায় তাহা রমণীদ্বেষী ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন।

এইরূপে কেশদন্তাদি শারীরিক অলঙ্কারের সহিত পুষ্পমণিরত্নাদি বাহ্য অলঙ্কারের ব্যবহার চলিতে লাগিল। কিন্তু বহির্জাতিক অলঙ্কারের মধ্যে বর্ণোৎকর্ষ-বিধায়ক এক প্রকার অলঙ্কার আছে। সৌন্দর্য্য বলিলে মনুষ্য প্রথমে দেহের বর্ণকেই বুঝিত। পরে দেহের গঠন ও অবশেষে সুগঠনের সহিত সুললিত অঙ্গভঙ্গীও সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। পুষ্পালঙ্কার ও বস্ত্রালঙ্কার গঠনোৎকর্ষ

বিধায়ক অলঙ্কার—কিন্তু চন্দনানুলেপনাদি বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক অলঙ্কার, এবং এই শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কারই যে প্রথমোদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্য আপনার ত্বকের উপরিভাগ যে সকল বর্ণে রঞ্জিত করিত বা তাহাতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিত তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিবার জন্যই বোধ হয় দেহলেখার উদ্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু এক প্রকার দেহলেখা যতই সুন্দর হউক না কেন কিছুকাল পরে তাহা অশোভন হইয়া পড়ে বলিয়াই বোধ হয় দেহলেখার প্রচলন বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে চিরস্থায়ী অলঙ্কারের পক্ষপাতী আমরা কেহই নহি; যে প্রকারের অলঙ্কারকে শীঘ্রই ধারণ ও উন্মোচন করা যায় তাহাই উন্নত প্রণালীর অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হয়।

অলঙ্কারের দ্বারা যে প্রয়োজনীয়তা সংসাধিত হয়, তাহা প্রথমতঃ কেবল সৌন্দর্য্য-নিবদ্ধই ছিল, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যসাধনই অলঙ্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনীয়তাও ঐ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ক্রমে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতাও উহার অপর একটি উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। পরিচ্ছদ দ্বারা যে কেবল সৌন্দর্য্য সংসাধিত হয় তাহা নহে, উহা স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতারও অনুকূল এবং উহাকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা যায়। এই নিমিত্ত আধুনিক সুসভ্য সমাজে ক্রমশঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কারেরই সমধিক প্রচলন হইতেছে।

অলঙ্কারের প্রথম প্রয়োজন সৌন্দর্য্য হইলেও এমন অলঙ্কার আছে যাহা সুন্দর হইলেও স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ইউরোপীয়

রমণীরা যে 'কর্‌সেট' পরিধান করেন তাহা এক প্রকার গঠ-নোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার কিন্তু তাহা যে স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক অলঙ্কার আছে যাহা কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই প্রথম ব্যবহৃত হইত, এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়াই ক্রমশ অলঙ্কারের পদবী লাভ করিয়াছে। ভুটিয়া রমণীগণ মুখমণ্ডলে যে লাক্ষার প্রলেপ দিয়া থাকে, তাহার আদিম উদ্দেশ্য শীত নিবারণ এবং আন্দামানবাসিগণ সর্ব্বাঙ্গে যে লোহিত-বর্ণ মৃত্তিকা লেপন করে তাহার আদিম উদ্দেশ্য মশকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দেশবাসীদিগের চক্ষে ঐ উভয় বস্তুই অতি রমণীয় অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ একদিকে রমণীগণ অতিশয় মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য অলঙ্কার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে তাঁহাদিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা, আয়তন ও গুরুত্বের হ্রাস হইতেছে। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, পরিশেষে সুসভ্য সমাজে প্রায় অধিকাংশ রমণীকেই অলঙ্কারহীনা হইতে হইবে এবং বিবাহ-কালে আর কেহই 'সালঙ্কারা কন্যা' পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও পুরুষ-জাতির বিশেষ ক্ষতি নাই কারণ অনেক স্বামীই পত্নীকে অলঙ্কার দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

বুঝিবার ভুল।

—:০:—

কোন্‌টা করি কিসের জন্য—

বুঝ্‌বে না তো ছাই,

তোমরা ভাব তোমরা ছাড়া

বুদ্ধিমান্‌ আর নাই।

বুঝ্‌বে না মোর ধরণধারণ

খুঁজবেনাকো সঠিক কারণ

সকল কাজেই ক'র্‌বে বারণ

এ বড় বালাই ;

কোনটা করি কিসের জন্য

বুঝেই দেখ ছাই।

২

কোন্‌টা করি কিসের জন্য

বুঝ্‌তে যদি ছাই,

মহাপুরুষ একটা আমায়

ব'ল্‌তে হে সবাই।

চাকরীটা খাঁটি গোলামী
তার আবার আগে সেলামী
ধুত্তোর বলে সেটা আমি
ছেড়ে দিয়ে তাই
ভাব্‌ছি শুধু হাজার বারো
টাকা যদি পাই।

৩

ভাবছি শুধু হাজার বারো
টাকা যদি পাই,
ব্যবসা কিম্বা তেজারতি
একটাতে লাগাই;
অবশ্য তা ক'রতে হ'লে
দুচার বছর যায়ই চলে
ব্যস্ত হ'য়ে তা—তা বলে
কোন্‌দিকেতে যাই?
ব'সে ব'সে সুইপেতে
টিকিট কিনি তাই।

৪

ব'সে ব'সে সুইপেতে
টিকিট কিনি তাই—

তোমরা কিনা মনে ভাব
ওড়াচ্ছি টাকাই।
আমি কিন্তু নানান্ কাজে
ঘুরে বেড়াই নানান্ সাজে
তোমরা ভাব সবই বাজে
মাথামুণ্ডু ছাই ;
নিজের মাপে আমায় মাপ
এই দুঃখ ভাই।

৬

নিজের মাপে আমায় মাপ
এই দুঃখ ভাই,
তাইতে ভাবি সব ছেড়ে দে
বনেতে পালাই।
এই যে সে দিন গিন্নী এসে
বল্লেন্ একটু কটু হেসে
"সংসারটা গেল ভেসে
কি দিয়ে থামাই ?
তুমি আছ ব'সে, যেন
রাজার জামাই।"

"তুমি আছ ব'সে যেন
রাজার জামাই"
করে নিলুম আবৃত্তিটা
তুলে দুটো হাই
বল্লুম শেষে "উপায় হবে
উপোষ ক'রে কেউ না রবে
বিধাতার এই বিপুল ভবে
আপাতত চাই
একটুখানি নির্জ্জনতা,
গৃহিণী মশাই।"

৭

"একটুখানি নির্জ্জনতা
গৃহিণী মশাই"—
যেমন বলা এলেন তেড়ে
যেন বুধী গাই;
শিং ছিল না রক্ষে সেই
আমার কিন্তু দুঃখ এই
একটা কোন মানুষ নেই
যাহাকে বোঝাই

কেন আমি কাজ না করে
ঘরে ব'সে খাই।

৮

কেন আমি কাজ না ক'রে
ঘরে ব'সে খাই
এ কথাটা ব'ল্‌লে এসে
সে দিন নেতাই;
সে যেন হ'য়েছে চাষা
ফসল ক'রে আছে খাসা
তার ত নেই আর উচ্চ আশা
আমি যে সদাই
ভেবে মরি কোন্‌টা করি
কোন্‌দিকেতে যাই।

৯

ভেবে মরি কোন্‌টা করি
কোন্‌দিকেতে যাই,
এডিটারি করি কিম্বা
বই লিখে ছাপাই;

মানটা থাকে বজায় কিসে
আদালতে কি আপিসে
হয় কি দিতে উকীল কিসে
ধর্ম্মটা জবাই—
এ সব ভেবে মরি আমি
তোমরা ভাব ছাই

কূলা।

—:●:—

হস্তী অগ্রে কি কূলা অগ্রে ইহা একটি স্থায়ের প্রশ্ন হইতে পারে। কারণ যদিও হস্তীর কর্ণের সহিত কূলার তুলনা দেওয়া হয়, তথাপি যদি হস্তী জাতি কূলার পরে জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কূলার সাদৃশ্যই হস্তীকর্ণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন্‌টি সত্য? ইহা যেন কালিদাসের সেই ভয়ঙ্কর সমস্যা—পার্ব্বতীর গমন অনুকরণ করিয়া রাজহংস চলিতে শিখিল কি পার্ব্বতীই ধার করিয়া মরালগমন শিখিলেন। আমার বোধ হয় দুই সমসাময়িক, নতুবা বিষম গোলে পড়িতে হয়।

কূলা থাকিতে পাখার সৃষ্টি হইল কেন? শ্রেষ্ঠ বলিয়া? কিসে শ্রেষ্ঠ? তালবৃন্ত যতটুকু বায়ুমণ্ডল ভেদ করে, কূলাতে তাহার কম করে না। ধরিবার অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু ঝুলাইয়া দিলে টানা পাখার কার্য্য হয় না কি? আমার বিশ্বাস যদি তালবৃক্ষের স্থায় কূলাবৃক্ষ থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি গৃহপ্রাঙ্গনে রোপন করিলে বৈদ্যুতিক ব্যজনও অনাবশ্যক হইত।

যাই হোক্, কেহ কূলার নিন্দা করিওনা, আমি সহিতে পারিব না। আমি কূলাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কূলাকে ধূলায় ফেলিয়া রাখিলেও উহার মর্য্যাদা ধূলি-সদৃশ নহে। উহা মঙ্গলময় ও

শিরোধার্য্য। কথা দুইটীর সার্থকতা আছে। উদ্বাহের পর স্ত্রী-আচারকালে উহা একটি প্রধান এমন কি অত্যজ্য উপাদান। উহাতে দর্পণ, সিন্দূর, দূর্ব্বা প্রভৃতি বরণ-সামগ্রী ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। উহার বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিলে তখন স্বতই ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। সুতরাং উহা পবিত্র ও শুভসূচক। শিরোধার্য্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নবজামাতা শ্বশুরালয়স্থ সকলেরই আদরার্হ হইলেও বরণডালারূপী কূলা তাহার মস্তকে আরোহণ করে এবং বরণকালে শ্যালিকাকুল কর্ত্তৃক কূলাঘাতে তাহার ললাট দেশ রক্তাক্ত হইলেও কূলার প্রতি কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় না। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শূদ্রের মস্তকে পদস্থাপন করিলেও শূদ্রের ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিবার অধিকার নাই, কারণ ব্রাহ্মণ শিরোধার্য্য। এস্থলেও সেইরূপ।

হে কূলা, তুমি অতিশয় বিজ্ঞ ও রসিক। সুন্দরীগণের অঙ্গুলির টোকায় তুমি নাচিয়া উঠ। তালে তালে তাহাদের বলয় শিঞ্জিতে থাকে, চুড়ী বাজিতে থাকে, আর তুমি স্থির হইয়া থাকিবে কিরূপে? হে সুভগ, তুমি গ্রাম্য হইলেও নাগরিকের ন্যায় বিদগ্ধ ও বিলাস-চতুর। সেই জন্যই তুমি এত রমণীপ্রিয়।

তুমি সদ্বিবেচক ও সারগ্রাহী। হংস যেমন দুগ্ধ হইতে জল পৃথক করিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ চাউল হইতে ধান্য এবং ধান্য হইতে কঙ্কর ও মৃত্তিকা পৃথক কর। তুমি সদ্বিবেচক না হইলে অসারকে অসার বলিয়া জানিবে কিরূপে এবং সারগ্রাহী না হইলে অসারভাগ পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? হায়, মনুষ্য যদি তোমার

মত সারগ্রাহী হইত, তাহা হইলে অবিচার সুবিচার হইত না, বন্ধুত্ব বিষময় হইত না, চাটুবাক্যে মন দ্রবীভূত হইত না এবং ইন্দ্রিয়-লালসা আধিপত্য করিত না। তাহা হইলে অবিমৃশ্যকারিতা ও অনুতাপ কমিয়া যাইত, সংসার অপেক্ষাকৃত সুখময় হইত। তুমি বিচার করিয়া বাছিয়া লও বলিয়াই সারগ্রাহী। তুমি চাকরীরক্ষেত্রে সুপারিস স্বরূপ, বিদ্যাক্ষেত্রে বাছনি-পরীক্ষা স্বরূপ এবং টাইটেল্‌ক্ষেত্রে চাঁদাপ্রদান বা উপঢৌকন স্বরূপ।

তুমি কখনো কখনো যে ভাবে পল্লীবাসিনীগণের হস্তে পরিচালিত হও তাহা অতি সুন্দর। ধান্য, তিসি অথবা সরিষার সহিত শুষ্ক পত্র বা ওষধিদণ্ড সংমিশ্রিত থাকিলে তোমাকে উহারা ঈষৎ সাচীকৃত দেহে পবন প্রবাহ মুখে ধারণ করে। ক্রমে ধান্যাদি শস্য তোমার নিম্নেই পতিত হয় এবং পত্রাদি লঘু পদার্থ দূরে নীত হয়। তোমার তখনকার সেই বঙ্কিমভাব কি সুচারুদর্শন! তখন তুমি যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের মস্তকস্থ ময়ূরপাখার ন্যায় পরিলক্ষিত হও।

সতের পীড়ন একটা জাগতিক নিয়ম। তুমি অতিশয় সৎ তাই মনুষ্য তোমাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। গার্সির দিন * তোমার পৃষ্ঠে অনবরত যষ্টিবৃষ্টি করিয়া তোমাকে বাটীর বাহিরে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কি ভাবিয়া যে তোমাকে প্রহার করা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অমঙ্গল ও ব্যাধি দূর করিবার জন্য? অমঙ্গল ও ব্যাধি কি তোমার গাত্রে লাগিয়া

* আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি।

থাকে ? অন্তস্থান পরিত্যাগ করিয়া তোমার গাত্রেই বা লাগিবে কেন ? উহারা কি ভূত প্রেতের ন্যায় ? ভূত প্রেত নাকি সংসারস্থ সকল বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া বিল্ব, তাল ও তিন্তিড়ী বৃক্ষেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তুমিত পবিত্র ও মঙ্গলময়! অশুচিস্থান ব্যতীত অন্যত্র দেবযোনির আবির্ভাব হইবে কিরূপে ? আর তাহা হইলে কূলার বাতাস দিয়া অলক্ষ্মী দূর করিবার প্রবাদ আছে কেন ?

তবে কি উহা একটা প্রাচীন পদ্ধতি মাত্র ? হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিহীন পদ্ধতি বড়ই দূষণীয়। যেদেশে বহুবিবাহ প্রচলিত সেদেশে উহাই পদ্ধতি ; কিন্তু তাই বলিয়া বহুবিবাহ একটা উত্তম কার্য্য নয়।

আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও কূলাপীড়নের কোন সদ্‌যুক্তি পাই নাই। তবে একটা কারণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গার্সির দিন শীত ঋতুর আগমনসূচক। ঐ দিন ব্যায়াম ও মল্লক্রীড়া করা হয়। কূলাপেটা বোধ হয় ব্যায়ামেরই অঙ্গীভূত। আমোদ ও রক্ত সঞ্চালন উভয়ই উহার উদ্দেশ্য। নিরীহ বাঙ্গালী বৎসরের একদিনও যদি ঐরূপ না করিত, তাহা হইলে প্রহার জিনিষটা একেবারেই ভুলিয়া যাইত।

কিন্তু হে কূলা, তুমিও কি ব্যায়াম করিয়া থাক ? নতুবা দারুণ প্রহারেও তুমি ছিন্ন ভিন্ন হও না কেন ? তোমার দেহ বোধ হয় কমঠ-পৃষ্ঠ অপেক্ষাও কঠিন, তাই সহসা ভাঙ্গে না। তাই বোধ হয় লোকে বলিয়া থাকে "মার আর ধর্ আমি পিঠ করেছি কূলো"। পাঠশালার ছাত্রগণ যদি পূর্ব্বে তোমায় পিঠে বাঁধিয়া

পড়িতে যাইত, তাহা হইলে যণ্ডামার্করূপী গুরুমহাশয়ের প্রচণ্ড ঘুষ্যাঘাতেও হাস্য করিতে পারিত।

কিন্তু তোমার এরূপ দৃঢ় ও সবল শরীরেও কি বাত আছে? নতুবা বেতের বাঁধনে তোমার উভয় পার্শ্ব বাঁধা কেন? কোন্ চিকিৎসক তোমার এরূপ ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিল যে তাহা খুলিতে গেলেও প্রাণ বাহির হইয়া যায়। যাই হউক, মনুষ্য তোমার প্রতি যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করে তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়। কখনো তাহারা তোমাকে মহাসমাদরে ভক্তিভাবে পূজা করে, আবার কখন প্রহারের চোটে তোমাকে অস্থির করিয়া তুলে। কি কারণে সহসা ভক্তি বিরক্তিতে পরিণত হয় তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ। আমার মনে হয় বুঝি ভক্তির চরম সীমাই অত্যাচার। যখন ভালবাসার অত্যাচার আছে, তখন ভক্তির অত্যাচার থাকিবে না কেন? ভক্তি ত ভালবাসারই নামান্তর।

মনুষ্য যখন তোমার প্রতি একবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তখন সে অত্যাচার বড় সহজে শেষ হয় না। তুমি ভাঙ্গিয়া গেলেও তোমার উপর অত্যাচার চলে। অর্দ্ধ খণ্ডের উপরও লোকে সহানুভূতি প্রকাশ করে কিন্তু ভগ্নদেহ তোমার উপর কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করে না। শরীর অকর্ম্মণ্য হইলে আপিসের কেরাণীরাও পেন্সন্ পায়, কিন্তু তোমার পেন্সন্ পাওয়া দূরে থাকুক, তুমি ভাঙ্গিয়া গেলেও তোমাকে আবর্জ্জনা বহন করিতে হয়। ভাঙ্গা কুলা ভিন্ন ছাই ফেলিবার উপযুক্ত দ্রব্য মানুষের চক্ষে অতি অল্পই আছে।

যাই হউক, তুমি অশেষগুণসম্পন্ন ও মনুষ্যজাতির পরম বন্ধু।

তুমি সকল ঋতুর সহায়; দারুণ গ্রীষ্মে তোমাকে পাথায় পরিণত করা যায়, বর্ষায় তোমাকে ছত্র করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাওয়া যায়, শরৎকালে তোমাতে ধান্য পরিমাণ করা যায়, শীতকালে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠের কার্য্য করা যায়, এবং বসন্তে তোমাকে ফুলের সাজির ন্যায় পুষ্পে পরিপূর্ণ করিয়া গৃহ সজ্জিত করা যায়। তুমি ঋষি, কারণ বিবাহাদি শুভ কার্য্যে মন্ত্র-দ্রষ্টা। তুমি শাস্ত্র, কারণ অতি পুরাতন। পুরাতন বলিয়াই কত প্রবাদ ও রীতি নীতি আমাদের দেশে শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে। তুমি অনন্ত ও অক্ষয়; কারণ যতদিন বাঙ্গলা দেশ আছে ও ধান চাল আছে ততদিন তোমার অন্ত নাই এবং মৃণ্ময়, প্রস্তর বা ধাতব পদার্থ অপেক্ষা তোমার ক্ষয় কম। তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি মাসে মাসে সংক্রান্তিতে তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিব। তুমি গৃহলক্ষ্মীর মত আমার গৃহে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিতে থাক।

উত্তরপাড়া,

১লা কার্ত্তিক ১৩১৮।

ঝাঁটা।

——:০:——
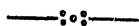
ঝাঁটানামক দিব্য প্রহরণ, যাহার ভয়ে সুরাসুর পর্য্যন্ত কম্পিত, সেই ভীষণ শতমুখী অস্ত্র আইনের নিষেধবিধির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আজও পর্য্যন্ত কি কারণে স্বচ্ছন্দতার সহিত বঙ্গ-গৃহে বিরাজমান রহিয়াছে? যদি একদিন সমস্ত ভারত-মহিলা ঘোমটা ও সেমিজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করে এবং ঝাঁটারূপ ব্রহ্মাস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে যথার্থই বিপদের কথা।

ঝাঁটার নাম শুনিলেই আমার মনোমধ্যে এই প্রশ্নগুলি স্বতই উদিত হয়, যথা—কোন্‌বংশীয় রাজার রাজত্বকালে ঝাঁটা প্রথম ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় এবং কাহার উদ্ভাবনী শক্তিতে এই মহা-শক্তিশালী, শল্লকীপৃষ্ঠসন্নিভ যন্ত্রটি শরীরলাভ করে; কোন্ মহাপুরুষ সামান্য নারিকেল পত্র হইতে বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলস্বরূপ এই ঝাঁটাযন্ত্রটি নিষ্কাষিত করিয়া সমাজকে উপহার দেন, যাহা প্রত্যেক বঙ্গীয় গৃহস্থালীর একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও যাহার প্রভাবে গৃহপ্রাঙ্গন হইতে সরকারী রাস্তা পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে?

অতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থেও সম্মার্জ্জনী শব্দ পাওয়া যায় এবং মহর্ষি পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণেও ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমান হয় যে ইহা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্ব হইতেই ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিতেছে। তবে, বিজ্ঞ পাশ্চাত্য সমালোচকের ন্যায় ইহাও সিদ্ধ করা যাইতে পারে যে ঝাঁটা সূর্য্যবংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। কারণ, যদি জনশ্রুতি (tradition) মিথ্যা না হয় তাঁহা হইলে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রই খর্জ্জুর তাল ও নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করেন। তিনি নাকি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষগুলি নাকি তাঁহারই সৃষ্ট। এ প্রবাদের সারবত্তা উদ্ভিদ্‌রাজ্য আলোচনা করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতীত হইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে খর্জ্জুর তাল ও নারিকেল বৃক্ষ অন্যান্য সকল বৃক্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন ও পরস্পর অনেকটা ভ্রাতৃভাবাপন্ন। সুতরাং উহাদের একজন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

এক্ষণ দেখা যাউক্ বিশ্বামিত্র কোন্ সময়ের লোক। তিনি বশিষ্ঠের সমসাময়িক এবং বশিষ্ঠ দশরথাদি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের কুলগুরু। সুতরাং বিশ্বামিত্র দশরথাদির সমসাময়িক। দশরথের পর তাঁহার অধস্তন ২২।২৩ পুরুষ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। সুতরাং ইহাই সম্ভবপর যে ঐ বংশীয় কোনও না কোন রাজার রাজত্বকালে ঝাঁটা নির্ম্মিত হয়। –

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা আপেক্ষিক গুরুতর। কোন নির্দ্দিষ্ট

ব্যক্তির নামের সহিত ঝাঁটা-নির্ম্মাণ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তবে কোন ঋষি যে উহার নির্ম্মাতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না ঋষিরাই শাস্ত্রানুশীলনরত, বিজ্ঞানবিৎ এবং উন্নতবুদ্ধি ছিলেন। হল-মুষলাদি যন্ত্রও ঋষিদিগের প্রণীত।

সে যাই হোক্, ধন্য সেই মহাত্মা যিনি ঝাঁটার শ্লাঘনীয় পিতৃ-পদবীতে অধিষ্ঠিত, যিনি ঝাঁটার জন্মদাতা। জেমস্ ওয়াট ও গ্যালভাইন্স অপেক্ষা তাঁহার সম্মান কিছুমাত্র কম নয়। আর ধন্য সেই নারিকেল বৃক্ষ যিনি দধীচের ন্যায় স্বীয় অবয়ব হইতে ঝাঁটার উপাদানীভূত পত্রাবলি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় পুণ্যবান্ আর কে আছে? তিনি দ্বাদশীতে পরিম্লানবদনা বিশুষ্ককণ্ঠা বালবিধবাদিগকে সুপেয় সুশীতল ফলাম্বুদানে তৃষ্ণা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন এবং অন্যান্য প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঝাঁটার কারণীভূত হইয়া তিনি সংসারের যেরূপ উপকার করিয়া থাকেন সেরূপ উপকার আর কে করিতে পারে?

প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জননী এই ন্যায়ানুসারে ঝাঁটা-নির্ম্মাণের মূলে যে অভাবজ্ঞানটি নিহিত ছিল, সেটি পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতামূলক। প্রথমতঃ নারিকেল-পত্র-মেরুদণ্ডই উহার উপাদান ছিল সন্দেহ নাই, কারণ উহা প্রকৃতিরাজ্য হইতে সংস্কার ও সংশোধন ব্যতিরিক্তই গৃহীত। কিন্তু মানুষ সকল বিষয়েই নিজের ক্রিয়াশক্তির আরোপ করিয়া তাহাকে অধিকতর উন্নত করিতে চায়। তাই পুষ্পগন্ধ স্থায়ী করিতে এসেন্স প্রস্তুত করে এবং দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের

জন্তু উপচক্ষু নির্ম্মাণ করে। সুতরাং ক্রমশঃ নূতন নূতন উপায়ে সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং উহাতে মনুষ্য ক্রমশই অধিক কার্য্যকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। সেই নিমিত্ত এক্ষণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সম্মার্জ্জনী প্রচলিত। কোথাও উহার কাঠিগুলি বেত হইতে চাঁছিয়া লওয়া হয়, কোথাও বা বাঁশ হইতে চাঁছিয়া লওয়া হয়, কোথাও উহা জনার নামক শস্যের দণ্ডমাত্র এবং কোথাও বা উহা ঝাউবৃক্ষের পত্রদ্বারা নির্ম্মিত।

কোন্ কোন্ দেশে ঝাঁটার কি কি নাম আছে তাহা জানিতেও পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদের সীমাভুক্ত নই বলিয়া সমস্ত বলিতে পারিব না, দুই একটী বলিব। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা ঝাঁটাকে 'সলা' বলেন। ২৪ পরগণার ইতর রমণীরা উহাকে 'খেঙ্গরা' আখ্যায় অভিহিত করেন এবং সময় সময় উহার সহিত "মুড়া" শব্দ সংযোগ করিয়া একটী অপূর্ব্ব যোগরূঢ় ভীতির নাম-করণ করেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই সুসভ্যজনমণ্ডলী 'ঝাঁটা' শব্দ এবং সংস্কৃতজ্ঞেরা 'সম্মার্জ্জনী' শব্দ ব্যবহার করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসীরা ঝাঁটাকে "ঝাড়ু" নামে সুশোভিত করেন। এ গুলি বেশ বুঝিলেন বটে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতভাষী পূর্ব্বপুরুষেরা ঝাঁটাকে কি কি বলিতেন তাহা শুনিলে অনেকের হৃদ্‌কম্প হইতে পারে। কিন্তু কি করিব, প্রবন্ধ-লেখককে অনেক সময় বড়ই নির্দ্দয় হইতে হয়। সে নামগুলি এই—১। শোষণী ২। উহনী ৩। সমূহনী ৪। বহুকরী ৫। বৰ্দ্ধনী।

প্রণিধান করুন, একটু ভাবিবার অবকাশ দিতেছি; ধাতু প্রত্যয়াদি বিবেচনা করিয়া দেখুন। দেখুন দেখি আপনার বুদ্ধি-বজরা কোন অর্থচড়ায় বাধিল কি? এস্থলে জল অতল; যাই হোক্ আমি কাণ্ডারী হইয়া কূলে লইয়া যাইতেছি। অর্থগুলি শাস্ত্রানুমোদিত না হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক। ঝাঁটা শোষণী অর্থাৎ দেহের সমস্ত রস শোষণ করিয়া লয়। পত্নীদ্বন্দ্বকারী পুরুষ এই নিমিত্ত প্রায়ই রুগ্ন-কলেবর। ঝাঁটা উহনী ও সমূহনী অর্থাৎ উহার প্রয়োগে উহু শব্দ স্বতই বহির্গত হয়। উহা বহুকরী অর্থাৎ এককে বহু করিতে সক্ষম। একটি চর্ম্ম উহার প্রভাবে অনেক সময় শতখণ্ডিত চর্ম্মে পরিণত হয়; অথবা উহার বহু কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। আছেই ত! উহাতে কখনও উন্মার্গগামী স্বামী একান্ত ভার্য্যানুরক্ত হ'ন (বোধ হয় জলধর চরিত্র আপনাদিগের মনে আছে); উহাতে স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কারাদি শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহাতে অতীব স্ত্রৈণ স্বামীও ভার্য্যাকে তদ্প্রার্থিত পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিয়া সুস্থ বোধ করেন। উহা বর্দ্ধনী অর্থাৎ তেজোবর্দ্ধনী। যে রমণীর হস্তে উহা থাকে তাহার সুপ্তশক্তি সহসা শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং দুষ্টা প্রতিবেশিনীর দর্প এবং দেহ একত্র ভূমিসাৎ হয়।

ঝাঁটার ব্যবহার যে কেবল ভারতবর্ষে সন্নিবদ্ধ তাহা নয়। ঝাঁটার গুণগ্রাম এক সময় সাগর পার হইয়া সুদূর য়ুরোপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ উহার ব্যবহার আজকাল পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'ক্রমষ্টিক্' শব্দটি অভিধান হইতে খসিয়া

পড়ে নাই। ঝাঁটার ব্যবহার দুই প্রকার—শাস্ত্রিক ও পারিষ্কারিক। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যবহারটি অতি সুন্দর এবং ভারতবর্ষাতিরিক্ত স্থানে কদাচিৎ প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সুসভ্য ইংরাজ পরোক্ত ব্যবহারটিও "Trundling mop" প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র-দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন। ঝাঁটার পরিবর্ত্তে ঐ সকল যন্ত্রে কত-দূর সুবিধা হয় বলিতে পারি না; তবে সুলভতা ও সর্ব্বত্রোপ-যোগিতা সম্বন্ধে ঝাঁটার সমকক্ষ আর কিছুই নাই।

ঝাঁটা বহিঃশৌচবিধায়ক। উহাকে আপোমার্জ্জনের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও চলে; কারণ আপোমার্জ্জনে সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিত্ব লাভ করা যায়। বাহ্যিক পবিত্রতা সম্পাদনের ঝাঁটাই প্রকৃষ্ট উপায়। ঝাঁটা যে স্থানে না বিচরণ করে সে স্থান ঘৃণিত, আবর্জ্জনাপূর্ণ ও ক্লেদকর্দ্দমসঙ্কুল। বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে অতি কদর্য্য স্থান সকলও সম্মার্জ্জনী সহায়ে এরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে তথায় বসিয়া পানাহার করিতেও কাহারও আপত্তি হয় না। গ্রামের বৃদ্ধ সম্প্রদায় একটি নূতন তত্ত্ব এই সম্পর্কে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যে স্থানে প্রত্যহ ঝাঁট পড়ে, সে স্থান দেবযোনিগণ লঙ্ঘন করিতে পারে না। যাঁহারা ভূতভয়ভীত তাঁহাদের পক্ষে এ কথা আশ্বাসপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের গৃহে যদি ঝাঁটা না থাকে তবে অদ্যই যেন তাঁহারা ঝাঁটাসংগ্রহে তৎপর হন। বিশেষতঃ ঝাঁটাইয়া বিষঝাড়া ও ভূতঝাড়া প্রভৃতি যে সকল কথা লোকপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, তাহার ভিত্তি যে নিতান্ত অমূলক নয়

তাহা বহুদর্শী গ্রাম্যগণ ঘটনা-উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিবেন।

যদি এ সমস্ত আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কয়েকটি পাশ্চাত্য কুসংস্কারের কথাও বলিব। খৃষ্টীয় জনসারারণের মধ্যে এখনও অনেকের বিশ্বাস আছে যে ঝাঁটা ডাইনীদিগের একটি মহৎ অবলম্বন। ইহার সাহায্যে নাকি তাহারা অঘটনও ঘটাইয়া থাকে। মন্ত্রপূত সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া এবং কোন কৃষ্ণমার্জ্জারের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহারা নাকি রাত্রিকালে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করে এবং অনেকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। একজন অর্দ্ধশিক্ষিত ধর্ম্মযাজকও যদি বৈকালিক পর্য্যটন কালে অকস্মাৎ পথিমধ্যে একগাছি ঝাঁটা দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ দশহাত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সরিয়া দাঁড়ান এবং অর্দ্ধস্ফুটস্বরে যেরীসুতের নাম উচ্চারণ করেন।

সুসভ্য ইংরাজজাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একপ্রকার বিবাহ-পদ্ধতি (irregular form of marriage) প্রচলিত ছিল যাহাতে দম্পতি পরস্পরের কর ধারণ করিয়া একগাছি ঝাঁটার উপর দিয়া লম্ফ দিয়া যাইতেন। ইহা ছিল তাঁহাদের Ritualএর অঙ্গ। বোধ হয় ইহাদ্বারা স্ত্রী স্বামীকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতেন যে আজ হইতে তুমি ঝাঁটার গণ্ডীর ভিতর আসিলে।

ইংরাজ জাতির অর্দ্ধোন্নত অবস্থায় Plantagenet নামধেয় একটি রাজবংশ ছিল। ঐ বংশীয়েরা genesta অর্থাৎ যে গাছের ডালে ঝাঁটার কাঠি প্রস্তুত হইত, তাহার চিহ্ন বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নের

ন্যায় ধারণ করিতেন। ঐ গাছকে তাঁহারা broom plant বলিতেন এবং বোধ হয় তুলসীর ন্যায় পূজাও করিতেন।

আমাদের দেশে একটি বিষয় অনেকেই দেখিয়াছেন কিন্তু কেহ তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। নূতন বাটী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় দেখা যায় যে বাটীর বনিয়াদের উপর একটি দীর্ঘ বংশদণ্ড প্রোথিত থাকে। ঐ বংশের শীর্ষদেশে একটি ভাঙ্গা ঝুড়ী, একপাটি ছেঁড়া জুতা ও একগাছি মুড়া ঝাঁটা দড়ি দিয়া ঝুলান থাকে। ইহা অতীব রহস্যময় ব্যাপার। নবগৃহনির্ম্মাতার অবশ্য এ উদ্দেশ্য থাকে না যে তিনি গ্রামের বা সহরের সমস্ত লোককে এককালে হাসাইবেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে অত উচ্চ করিয়া দিবার অর্থ কি? কেহ কেহ কিন্তু বলেন, উহাতে নূতন বাটীর উপর কোন প্রকার কুদৃষ্টি পড়ে না। শনির কুদৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মনুষ্যের কুদৃষ্টিতে যে বাড়ী ধ্বংশ হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আকাশ প্রদীপের অর্থও ঐরূপ বুঝি নাই। কার্ত্তিকমাসের রাত্রি কি এত বেশী অন্ধকার যে পাছে লোকে বাড়ীর গায়ে ধাক্কা খাইয়া মরে তাই একটা আলোর ব্যবস্থা করা হয়?

ঝাঁটাসম্বন্ধীয় আর একটি তর্ক সম্প্রতি আমার মস্তিষ্ক বিশেষ-রূপে আলোড়িত করিয়াছে। আকাশে মধ্যে মধ্যে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহা নাকি দেখিতে ঠিক ঝাঁটার মত। দুর্ভাগ্যক্রমে

কথনও স্বচক্ষে দেখি নাই তাই এবিষয়ে স্বীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিলাম না। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ মহোদয়েরা একথা অতিশয় দার্ঢ্য-সহকারে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে প্রথমে একটি তারা এবং তাহার পশ্চাতে একটি দীর্ঘ ঝাঁটার ন্যায় আলোকপুচ্ছ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা ধূমকেতু। বেশ! কিন্তু ধূমকেতুটা কি? ধূমকেতু কি আকাশের ঝাড়ুদার যে কোমরে ঝাঁটা বাঁধিয়া আকাশ ঝাঁট দিয়া বেড়ায়? আশ্চর্য্য নয়। তারাগণ চন্দ্রবর্ণিতা ও বিলাসপ্রিয়া। তাঁহারা যে আসনে বসিয়া মজলিস মারেন, তাস পেটেন, পান ছোড়াছুড়ি করেন, ফুল লোফালুফি করেন, সে নীল ভেলভেটখানি মাঝে মাঝে পরিষ্কার না করিলে চলিবে কেন? আর ধূমকেতু প্রভৃতি নাম ঝাড়ুদারদিগেরই থাকা সম্ভব। অতএব সাব্যস্ত হইল যে ধূমকেতু নিশ্চয়ই আকাশের ঝাড়ুদার।

ঝাঁটা বঙ্গীয় গৃহস্থালীর Penal code. এককথায় ইহাকে বঙ্গালয়ের D. P. C. (Domestic Penal code) বলা যাইতে পারে। ইহা বর্ত্তমান সুসভ্যযুগের মার্জ্জিত শাসনদণ্ড। জানিনা ইহা যমদণ্ডের অপেক্ষাও ভয়াবহ কিনা কিন্তু পূর্ব্বোক্তের ভয়ে অনেকে যে শেষোক্তের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহা নাটককার ও ঐতিহাসিক উভয়েই অনেকস্থলে চিত্রিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা নাই যেহেতু আমার ভাগ্যে কোনটিই ঘটে নাই। তবে সম্মার্জ্জনীবিধি যে গৃহে গৃহে প্রচলিত আছে তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বলিতে বাধ্য। দণ্ড যতদিন প্রযুক্ত না হয়, ততদিন

যে আইনের অস্তিত্ব থাকে না তাহা নহে।* যাঁহারা উচ্চ বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাই জানেন যে অব্যক্ত (latent) শক্তিই ব্যক্ত (kinetic) শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

ঝাঁটার শাস্ত্রিক প্রয়োগটা বারযোষিৎগণই সবিশেষ অবগত আছেন। কারণ এটি তাঁহাদিগকে একটি বিদ্যার ন্যায় অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমতঃ রসনারূপ মিছরির ছুরি কি করিয়া পুরুষবক্ষে চালাইতে হয় এবং তদ্দ্বারা সকল অনর্থের মূল অর্থ-রুধির কি করিয়া বহিষ্কৃত করিতে হয় তাহার শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপে জলৌকা-বিদ্যা শেষ হইলে শার্দ্দূল-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। যখন হতভাগ্য প্রণয়িগণের পকেট বায়ুভরে উড়িয়া থাকে, তখন নাকি এই শেষোক্ত বিদ্যাপ্রয়োগের সময় আইসে তখন ক্রমান্বয়ে বিরক্তিপ্রকাশ, গালিবর্ষণ ও ঝাঁটাপীটন হইয়া থাকে। শার্দ্দূলবিদ্যায় ঝাঁটাপীটনই চরম সীমা।

আইনের কৃপায় দুর্ব্বল ব্যক্তি সবল অপেক্ষাও বলী। সাধু দুর্ব্বলকে অত্যাচারী বলীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে এবং সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে দণ্ডের প্রবর্ত্তন। নারী অবলা, কাজেই পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। কিন্তু তাহাদিগের হস্তে সম্মার্জ্জনী-দণ্ড ও বিচারভার উভয়ই ন্যস্ত; দুর্ব্বলের হস্তে সর্ব্বত্রই এই প্রকার বহিঃশক্তিনিয়োগ দেখিতে পাই; গৃহরাজ্যে তাহা না থাকিলে, জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইত এবং অরাজকতা প্রবল

* "A law never becomes obsolete by desuetude"—
Holland.

হইত ; সুতরাং রমণীহস্তে যে কোন পুরুষশাসনের দণ্ড থাকিবে ইহাতে যুক্তিযুক্ত। হস্তী শাসনের জন্য অঙ্কুশ আছে, অশ্ব শাসনের জন্য চাবুক আছে, গো শাসনের জন্য পাঁচনবাড়ী আছে ; বালক শাসনের জন্য ছ্ঁাচিবেত আছে, আর পতিরূপ দুর্দ্ধর্ষ জীব শাসনার্থ সম্মার্জ্জনী দণ্ড আছে এবং থাকাই একান্ত উচিত। *

যাই হউক, হে ঝঁাটা তুমি মহাপুরুষ বটে। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি একবার বল দেখি ; তাহা হইলে আমিও একবার কবির ভাষায় চীৎকার করিয়া বলি "ভো ঝঁাটামণ্ডল বল স্বরূপ, কে দিল তোমায় এরূপ রূপ ?" এমন সজারুর ন্যায় কণ্টকময় দেহ এমন অপূর্ব্ব লোহার কোমর-বন্ধ তোমায় কে দিল ? তুমি কে একবার প্রকাশ করিয়া বল দেখি। তুমি কি কোন শাপ-ভ্রষ্টা বিদ্যাধরী ? আর বাড়ুন কি তোমার ছোট বোন্ ? তিনি ঘরের কোণ নিকান, দেওয়াল পরিষ্কার করেন, উঠান ঝঁাট দেন আর তুমি গলি, নর্দ্দমা ও পথ পরিষ্কার কর ? তা কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়াছ বটে কিন্তু তুমি অজ্ঞাতকুলশীল। বিষ্ণুশর্ম্মার মতে তোমাকে ত বাসস্থান দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তবুও তোমার অনেক গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি ; তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

ভবানীপুর,
১২ই শ্রাবণ ; ১৩১৮।

---

* Vide B. C. chatterjee's. "Matrimonial Penal code."

দুর্ব্বুদ্ধি। *

—:*:—

কেন ভেঙ্গে গেল ছাতি?
আমি, ঝড়ের মুখেতে ধরেছিনু তারে
পড়ে যায় যাতে হাতী,
তাই ভেঙ্গে গেল ছাতি।

কেন পেকে গেল চুল?
আমি ছেলে বেলা হ'তে ফিলজফি পড়ে
করেছিনু বড় ভুল,
তাই পেকে গেল চুল।

কেন কেটে গেল গদী?
আমি ছারপোকা তার চাহি মারিবারে
ছুরি দিয়া নিরবধি—
তাই কেটে গেল গদী।

কেন মুখে নাই তার?
আমি ব্যঞ্জনে ঝোলে বড় বেশী ঝাল
দিয়েছিনু লঙ্কার
তাই মুখে নাই তার।

---

* কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাকাঙ্ক্ষা' নামক কবিতার লালিকা।

হালখাতা।

—:*:—

নববর্ষে নানাদেশে নানা উৎসব। আমাদের এ দীন দেশে পূর্ব্বে কি উৎসব ছিল তাহা জানি না। তবে, "প্রাপ্তে নূতন বৎসরে প্রতি-গৃহে কুর্য্যাদ্ধ্বজারোপণম্" প্রভৃতি শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে উৎসব একটা না একটা ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের নববর্ষোৎসব সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছি. অধুনা কেবল ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের খাতা-পরিবর্ত্তনে তাহার কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা পূর্ব্বে গৃহে গৃহে আনন্দের কলকোলাহল জাগাইয়া তুলিত, তাহাকে বিপণির সংকীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করি; তবে এই হাল-খাতার মধ্যে আমরা নববর্ষের যৎকিঞ্চিৎ একটু আস্বাদ (তাহা ভাবমূলকই হউক আর জিহ্বামূলকই হউক) পাই বলিয়া উহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

বিগত ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশের লোকেরা হঠাৎ কেমন গুরুগম্ভীর ও বিজ্ঞতাভিমানী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বিচির মত যাঁহাদের ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ ছিল এবং গণিয়া দেখিলে উপপার্ব্বণ সমেত ১১৩টি ছিল বলিলেও দোষ হয় না তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপ ভাঙ্গাইয়া যে সে স্থলে খাজাঞ্চিখানার ব্যবস্থা

করেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের এ আনন্দপ্রবণ দেশে হাস্যকৌতুক চিরদিনই অপর্য্যাপ্ত ছিল। এই বিমল-কিরণোদ্ভাসিত, ধূম-জলদ-বাষ্প-বিরহিত, অনাবিল গগনচন্দ্রাতপের নিম্নে শ্যামলাঞ্চলা ভারতভূমির রসাভিসিঞ্চিত বক্ষে বক্রনাস, কুঞ্চিত-ভ্রূ, বিলোলগণ্ড, লুণ্ঠিতাধর, লম্বিতচিবুক পেচকধর্ম্মিগণ একান্তই অশোভন এবং অস্বাভাবিক।

আজকালকার প্রবীণেরা পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবা পুরুষকেও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দেখিলে, নাসিকা কুঞ্চিত করেন এবং যৌবনসুলভ রঙ্গপরিহাস বা উচ্চহাস্য শ্রবণ করিলে, অধঃপতনের আর বিলম্ব নাই বলিয়া চীৎকার করেন; হোলির দিন কেহ গাত্রে আবির প্রক্ষেপ করিলে একেবারে পুলিশের নিকট দৌড়াইয়া যান। যে ব্যঙ্গপ্রিয়তা রসপ্রাণতা এবং সহৃদয়তায় সর্ব্বত্র আমোদোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, সে সকল কিছুই আর নাই। আছে কেবল বিমর্ষতা এবং অবসাদ, পরিশোষক অর্থচিন্তা এবং নিভৃত কক্ষে বসিয়া পরাহিতচর্চ্চা।

দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থায় উৎসব একান্ত আবশ্যক। উৎসব মানব-জীবনের কিরূপ একটি অপরিহার্য্য উপাদান এবং উৎসবের শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা কিরূপ, তাহার আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। সকল দেশে সকল সময়েই অল্পাধিক মাত্রায় উৎসবের প্রয়োজন; বিশেষতঃ যে জাতি যত নিস্পন্দ স্ফূর্ত্তিহীন ও জড়িমা-যুক্ত, তাহার উৎসবের প্রয়োজন তত অধিক। এই জন্যই আমাদের দেশে আজকাল উৎসবের সমধিক আদর হওয়া উচিত। একটা

নূতন উৎসব গড়িয়া প্রচলিত করা দুঃসাধ্য এবং তাহা বড় শীঘ্র সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না ; কিন্তু যে সকল উৎসব পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, তাহার রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য ; তাহাদেরও বিলোপ সাধন হইতেছে দেখিয়া যথার্থই আশঙ্কার উদ্রেক হয়। কোথায় সেই ইন্দ্রপূজা, কোথায় বা সেই মদনোৎসব ! একে একে সমস্তই কালের অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা কদাচিৎ কোথাও দেখা যায়। এরূপ বিলুপ্তপ্রায় উৎসবের মধ্যে নববর্ষ একটি সামান্য নহে। একটি মুদ্রা জলে পড়িয়া গেলে, তাহা তুলিবার জন্য, আমরা কত যত্ন করি, আর এই জাতীয় রত্নভাণ্ডার-স্বরূপ নিমজ্জমান উৎসবটিকে উদ্ধার করিবার জন্য কি আমাদিগের সচেষ্ট হওয়া উচিত নহে ? বিশেষতঃ নববর্ষ এমন একটি উৎসব, যাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারেন ; আর ধর্ম্মমূলক নহে বলিয়া যে ইহা পরিবর্জ্জনীয়, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। ইংরাজের All fools Day অর্থাৎ April মাসের প্রথম দিন এবং St. Valentine's Day অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি যে উৎসব হয়, তাহা ধর্ম্মমূলক নহে বলিয়া কি ইংরাজেরা তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন ?

সুতরাং অধুনা নববর্ষোৎসব কেবল মাত্র হালখাতায় পর্য্যবসিত হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহারা বৈশাখের প্রথমদিবসে হাল-খাতার নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া কোন ব্যবসায়ীর ভবনে পদার্পন করিবেন, তাঁহারাই এই নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসব-বহ্নির যে স্ফুলিঙ্গটুকু

এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার সুখোষ্ণতা অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, এখনও বিপণি-সৌধচূড়ে পতাকাসকল সান্ধ্যসমীরণে মৃদুমন্দ ভাবে উড্ডীয়মান্। পুষ্প, মাল্য, দেবদারুপত্র সহকার-পল্লব ও মঙ্গলকলসে বিপণিদ্বার সুসজ্জিত, বিবিধ বর্ণের বস্ত্রাদিতে অভ্যন্তরদেশ মণ্ডিত ও সুগন্ধি জলসেচনে চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ ও সুরভিত। প্রবেশ করিবামাত্র সাদরাহ্বানে ও অভ্যর্থনায় ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে করিতে হয় যেন আমরাই উত্তমর্ণ; —টাকার তাগাদায় আসিয়াছি, অথবা যেন আমাদিগের নিকট প্রাপ্য অর্থে উক্ত মহাজনের ন্যায্য অধিকার কিছুই নাই; যেন তিনি উহা আমাদিগের চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক করুণা-ভিক্ষাস্বরূপ লাভ করিতে লালায়িত। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের এইরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা বৎসরের আর কোন দিবসেই উপস্থিত হয় না। সেই নিমিত্ত হালখাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা বড়ই লোভনীয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যদি কেবল রমণীয় দৃশ্যে ও আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া আসিতে হইত, তাহা হইলেও বিনাব্যয়ে তাহাই যথেষ্ট হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু গৃহস্বামীর উদারতায় ঐরূপ ভাবে চলিয়া আসিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি উপবেশন করিবামাত্র তাঁহার মস্তকে বসুধারার ন্যায় অজস্র গোলাপজল বর্ষিত হইল, আতরাদি সুগন্ধি দ্রব্যে তাঁহার বসনপ্রান্ত এবং নিবিড় গুম্ফরাজি সদ্যঃস্ফুট কুসুমের ন্যায় সুরভিত হইল এবং বৈদ্যুতিক ব্যজন সত্ত্বেও তালবৃন্ত তাঁহার দিকে সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তাহার পর বরফ-সুশীতল সরবৎ, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও তাম্বুলাদির প্রতি

যথাবিধি সুবিচার করিলেই তবে তাঁহার নিষ্কৃতি। এরূপ মধুর উৎসব গৃহে গৃহে প্রচলিত হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে?

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করি। নববর্ষে আমরা এ উৎসব করি কেন? নববর্ষ আসিয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র নবভাব দেখিতে পাই কি? প্রকৃতি নববর্ষের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কিছু পূর্ব্ব হইতেই নব সাজে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে সাজ ক্রমে পুরাতন হইতে চলিল। বিগত বর্ষের অনেক নূতন চিন্তা, নূতন কার্য্য, নূতন উৎসাহ পুরাতন হইতে চলিল, তবে নবত্ব কোথায়? নববর্ষ আসিল বটে, কিন্তু অনন্ত নীলিমার রাজ্যে কোন পরিবর্ত্তন হইল কি? তপন-কিরণে কোন নূতন বর্ণচ্ছটার, কৌমুদীতে কোন নব স্নিগ্ধতার নক্ষত্রমালার জ্যোতিতে কোন নূতন রমণীয়তার আবির্ভাব হইল কি? বিহঙ্গম-কাকলীতে কোন নূতন মাধুর্য্য, কুসুমবিকাশে কোন নূতন সৌরভ, সমীরণ-প্রবাহে কোন নূতন স্পর্শ-সুখের আবির্ভাব হইল কি? পুরাতন বর্ষেও যাহা ছিল, নববর্ষেও তাহাই আছে। সেই তো গৃহে গৃহে অশ্রু-হাসি, শান্তি-কোলাহল, উদ্যম-অবসাদ ও দৈন্য-স্বচ্ছলতার যুগান্তব্যাপী অভিনয় চলিতেছে; সেইত কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য-নিষ্ফলতা, দণ্ড-পুরস্কার, আশা-নৈরাশ্যের একমুখী স্রোত প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে। সেইত নিসর্গ-রাজ্যে মেঘ-রৌদ্র, আলো-অন্ধকার ও জীবন-মরণের শাসন আমাদিগের উপর অপ্রতিহত-ভাবে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—তবে নবত্ব কোথায়? তবে এই উদীয়-মান বর্ষকে নববর্ষ বলি কেন?

স্মরণাতীত কাল হইতে বৈশাখ মাস যে মূর্ত্তি লইয়া আমাদের গৃহদ্বারে অতিথির ন্যায় উপস্থিত হয়, এবার যখন সেই সাদৃশ্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, তখন তাহাকে 'নব' বলিতে পারি কৈ ? কেবল স্বীকার করিতে হইবে যে একটি বর্ষ চলিয়া গিয়াছে ও আর একটি বর্ষ আসিয়াছে। এ বিষয়ে চন্দ্রার্ক সাক্ষী, সুতরাং কে সন্দেহ করিবে ?

তথাপি জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে নববর্ষ কথাটির সার্থকতা কি ? অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, তাহা নূতনও নহে, পুরাতনও নহে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন এবং ইয়ত্তা বিহীন। আমাদিগের জ্ঞানের সংস্পর্শেই তাহা গুণধর্ম্মবিশিষ্ট। আমাদিগের নিকট যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাই কিছু পরে অতীত এবং যাহা এক্ষণে ভবিষ্যৎ, তাহাই কিছু পরে বর্ত্তমান হইবে। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, সময়ের গতিও আমাদের কল্পনার বিকার মাত্র। যাহা সম্প্রতি মনের বিষয়ীভূত, তাহার তুলনায় অন্য বিষয়ের যে মানসিক দূরত্ব, তাহাই ভূত-ভবিষ্যৎরূপে প্রতীয়মান ; সুতরাং এরূপ অর্থে নববর্ষ একান্তই নিরর্থক।

নববর্ষ বুঝিতে গেলে, আগে বর্ষ কি দেখা যাউক। দিন ও মাসের ন্যায় বর্ষও সময়ের একটী পরিমাণ বা মানদণ্ডস্বরূপ (unit of measurement)। সময়ের পরিমাণ না থাকিলে, তাহার পথ চিহ্নশূন্য হইত, কার্য্যের ও সুখ দুঃখের পরিমাণ থাকিত না, জীবন দুঃসহ হইত ; তাই নিরবচ্ছিন্ন সময়কে বর্ষাদি কাল্পনিক ও কৃত্রিম বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

তবে, বর্ষ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরিমাণ হইলেও, যে কোন দিন হইতেই আমরা তাহার গণনা করিতে পারিতাম। যে কোন মাসের যে কোন দিনই নববর্ষের প্রারম্ভ হইতে পারিত। তবে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনকেই নববর্ষ বলি কেন? ইংরাজদিগের নববর্ষ অধুনা ১লা জানুয়ারী অর্থাৎ পৌষ মাসের কোন একদিন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে উহা ২৫শে মার্চ্চ অর্থাৎ চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ছিল। অন্য অন্য জাতি অন্যান্য দিন হইতে নববর্ষ আরম্ভ করিয়া থাকেন; সুতরাং একটী নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। যে কোন দিনকেই নববর্ষাভিধানে গৌরবান্বিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই গণনা জনসমাজের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন বলিয়াও বোধ হয় না। কোন বিশেষ ঘটনা, যথা;—কোন যুদ্ধজয় বা মহাপুরুষের জন্মের স্মরণার্থ উহার প্রবর্ত্তন হইতে পারে। খৃষ্টানদিগের (New Year's Day) তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাঁহাদিগের মতে সমগ্র মানবজাতির আদিপুরুষ আদমের জন্মদিন। আমাদিগের নববর্ষও সম্ভবত সূর্য্যকুলগৌরব শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দিন। * তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নহি বলিয়া এ বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

কিন্তু ইহাই নববর্ষের নবত্বের ব্যাখ্যা নহে; কারণ তাহা হইলে আমরা নববর্ষকে প্রারব্ধ বর্ষ ও পুরাতন বর্ষকে বিগত বর্ষ বলিয়াই সন্তুষ্ট হই না কেন? ইহার মধ্যে কি মানবের মনস্তত্ত্বঘটিত কোন প্রহেলিকা নিহিত নাই?

---

* হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদেরা কিন্তু ইহার কারণান্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মানসরাজ্যে, আমাদিগের কল্পনায়, আমরা নূতনকে উৎসাহ, আশা ও প্রীতির চক্ষে দেখি। তাই, সত্য হউক মিথ্যা হউক, একটা ভেদসূত্র টানিয়া পুরাতনকে নূতন হইতে পৃথক করিয়া দিই। আমরা চাই যে অবিরাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, এমন একটা দিন আসিবে, যখন আমরা স্থির-চিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে পারিব যে, বিগত দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমরা কি কার্য্য করিয়াছি, কি কার্য্য করিতে পারি নাই, কত শিক্ষা লাভ করিয়াছি,—কতই বা আবার শিখিতে পারি নাই,—কত সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া আমাদের জীবনের এই ক্ষুদ্র ভেলাটিকে কতদূর বাহিয়া আনিয়াছি। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অতীত দুঃখরাশিকে পুরাতন মনে করিয়া মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করি এবং নবোৎসাহে ও নবীন উদ্যমে পুনরায় কার্য্যারম্ভ করি। এই জন্যই আমরা পুরাতন বর্ষকে যেমন একবিন্দু অশ্রুর সহিত চির-বিদায় দিয়া নূতনকে প্রিয়তম বন্ধুর মত বক্ষে তুলিয়া লই, সেইরূপ গতবর্ষের যত শোকতাপ, নৈরাশ্য, নিষ্ফলতা, দুঃখ, দুর্ভাবনা, সমস্তই পুরাতন বলিয়া ভুলিতে চেষ্টা করি, এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে পুনরায় নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতে প্রয়াস পাই। এই জন্যই যেমন আমরা পুরাতন বর্ষকে মৃত বর্ষ বলিয়া তাহার শিক্ষা, উপদেশ এবং বিষাদস্মৃতিটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি, সেইরূপ অতীত বর্ষের যাহা কিছু অপ্রিয় এবং অশুভ ছিল, তাহাকে মৃতের মধ্যে পরিগণিত করিয়া, জীবিতের সহিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হই।

নববর্ষে এই যে অপ্রিয়-বর্জ্জন ও প্রিয়ালিঙ্গন, এই যে অতীতের অভিজ্ঞতা দ্বারা ভবিষ্যতে কার্য্য পরিচালনের সংকল্প, ইহাই আমাদের হালখাতা নামে অভিহিত হইতে পারে। ব্যবসায়ী যেমন তাহার পুরাতন বর্ষের খাতা হইতে পরিশোধিত ঋণ বাদ দিয়া, যাহা এখনও আদায় হইতে বাকি আছে, তাহাই নূতন খাতায় তুলিয়া রাখে; আমরাও যেন সেইরূপ গতবর্ষে যে সকল কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারি নাই, তাহাই নূতন বর্ষে সমাপ্ত করিবার জন্য ধরিয়া লই; আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র অবসরগুলি হেলায় হারাইয়া, দত্তঋণ পুনরুদ্ধার্থে অসমর্থ ব্যবসায়ীর মত আমরাও যেন কপালে করাঘাত করিতে না হয়। ব্যবসায়ী যেমন টাকায় সিন্দূর মাখাইয়া খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার ছাপ মারিয়া লয়, আমরাও যেন সেইরূপ ভক্তিপূর্ণ অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মের ছবি আমাদিগের মানসপটের সর্ব্বোচ্চস্থলে অঙ্কিত করিয়া লই। আমরা যেন নববর্ষের দিন সকল অতীত লজ্জা ও দৈন্য বিস্মৃত হই, বৃথা কলহ-কোলাহল পরিত্যাগ করি এবং নূতন আনন্দে, মধুর ব্যবহারে আমাদের চতুর্দ্দিকে নন্দনকাননের শান্তি ও শোভার প্রতিষ্ঠা করি। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে নববর্ষের সম্বর্দ্ধনা করিতে সমবেত হই, তাহা হইলে নববর্ষও আমাদের শীর্ষে তাহার মাঙ্গল্য-পুষ্প বর্ষণ করিবে।

ভবানীপুর,

২০শে চৈত্র ১৩১৬।

প্রণয়-বিভ্রাট।

——:•:——

ভাবিনু যেদিন,—হইতে অন্ত
আনিব জীবনে একটু পদ্য,
যেন সে সরস গোলাপী মন্ত—
পড়িনু সে দিন চিন্তায় ;

"ক্লাবে, পরিষদে আর আদালতে
চলেছে জীবন একটানা, পথে
ব্রীফ্ ঘেঁটে, চিঠি লিখে কোন মতে
চলে নাক আর দিন তায়।

"জীবনে যা কিছু কবিতা,—প্রণয়,
মিছে আর সব, কিছুই ত নয়—
তাই শেষে মনে হইল উদয়
পড়িবই প্রেমে এইবার ;

"কিন্তু কোথা সে প্রেম নিরমল
পারিজাত জিনি যায় পরিমল,
আবেগে আবেশে এ হৃদি-কমল
লুটাইব বল পদে কার ?"

প্রশ্ন এমনি করিনু যখন,
সখা উপদেশ দিলেন তখন—
"হে চিরকুমার বিবাহ এখন
প্রয়োজন তব, জেনো তাই।"

আমি ভাবিলাম "এত বড় জ্বালা!
বার বছরের নাবালিকা বালা
চেলির পুঁটুলি, ক্রন্দন-ডালা,—
প্রণয়ের সেকি জানে ছাই?"

বন্ধুর কথা উড়াইয়া হেসে,
গেলাম স্বাধীন প্রণয়ের দেশে —
যেথায় শুভ্র মরালের বেশে
ফিরিছে কুমারী দলেদল;

কেহ বিংশতি ততোধিক কেহ,
প্রজাপতি সম সজ্জিত-দেহ,
ভাবিলাম—হেথা নাহি সন্দেহ
ফুটিবে আশার শতদল

কিন্তু দেখিনু হ'লে পরিচয়
করে এই সব কুমারীনিচয়
রজতের সনে প্রেম বিনিময়,
প্রেমেও ব্যবসা, আরে রাম!

তাছাড়া বড়ই কোমলতাহীন,
তীব্র, নির্লাজ, মুখর, কঠিন
এ সব রমণী, তাই কিছুদিন
পরেই দেশেতে ফিরিলাম

তারপর আমি পূজা-অবকাশে—
কপোত যেমন সুনীল আকাশে—
উড়িনু আবার ভ্রমণের আশে,
অথবা প্রণয়-সন্ধানে ;

ভ্রমিলাম কত ঘন শালবন,
সাগরের তীর বালুকাভবন,
কত গিরিশির, যেথায় পবন
দেহেতে নব জীবন দানে।

তথাপি না পাই প্রাণ যাহা চায়,
হেনকালে আহা কি দেখিনু হায় !
পাহাড়ী বালিকা হরিণীর প্রায়
ভ্রমিছে লঘু চরণ দিয়া ;

মুখে চোখে তার সরলতা মাখা
চীরবাসে আধ যৌবন ঢাকা,
সুন্দর যেন শরতের রাকা
অঙ্গেতে গেছে বিগলিয়া।

মনে ভাবিলাম—এতদিনে কূল
লভিয়াছে মোর হৃদয় ব্যাকুল—
তদবধি প্রতিদিন কিনি ফুল
দিতাম তাহারে উপহার,

কিন্তু সে শুধু স্নিগ্ধ সরল
কাল আঁখি দুটী করিয়া তরল
চাহিত মুখেতে, বিলাস-গরল
ছিলনাক কিছু মাঝে তার।

গেল কিছুদিন ;—কই এত নয়
আমি যাহা চাই তেমন প্রণয় !
থিয়েটারে যাহা করে অভিনয়
তাওত এ নহে অবিকল !

কোথা লুকোচুরি, লাজে ভরা হাসি
রক্তিম মুখে বলা "তবে আসি"
কোথা চ'লে যেতে আঁখিনীরে ভাসি
ফিরে ফিরে দেখা করি ছল ?

ফিরিলাম দেশে এবারো আবার,
ছেড়ে দিনু আশা প্রণয় পাবার,
ভাবিলাম প্রায় হয়েছে যাবার
সময় তো, ডাকি ভগবান্।

হেন মনে করি করি উপাসনা
একেবারে ছাড়ি প্রেমের বাসনা
প্রথমে কমলা কমল-আসনা
শেষে নিরাকার সুমহান।

সহসা তাঁহার কৃপায় আমার
মিলিল প্রেমের বস্তু সাকার
তদবধি আমি গৃহেতে কাকার
দেখিলাম থাকা সমীচীন,

যেহেতু তাহার নিকটেই জানি
নায়িকার মোর ছিল গৃহখানি,
গোপনে নীরব নয়নের বাণী
কাজেই চলিল কিছুদিন

কিন্তু তথাপি মনের মতন
হ'ল নাক এই প্রণয় রতন,
যেহেতু করিয়া অনেক যতন
মিলিনু যে দিন বাগিচায়,

সে দিনেই তাঁর কৃত্রিম ভাব,
আঁকাবাঁকা কথা, ভাবের অভাব,
বাজিল হৃদয়ে, তা ছাড়া স্বভাব
নহে যাহা ঠিক্ প্রাণ চায়।

বুঝিলাম সব, তথাপি কি করি ?
ছেড়ে দিলে একেবারে ডুবে মরি,
কাজেই রহিনু আশা-সূতা ধরি—
আশাতেই প্রাণ থাকে ঠিক্।

ভাবিলাম—হবে বুঝিবার ভুল,
কেটে যাবে মেঘ, হাসিবে অতুল
প্রণয়ের শশী, কি হেতু বাতুল
হ'য়ে ছুটে মরি দশ দিক্।

আছে বটে তাঁর দেহে নানা রোগ
যথা নির্জ্জনে হিষ্ট্রীয়া ভোগ
আছে বটে ঘন ঘন অনুযোগ
তবু ভাল এই সব দোষ,

কেবল যে তিনি কুসুমের ঘায়
হ'ন আধমরা, সেই বড় দায় ;
আর ধরি ধরি ধরা নাহি যায়—
এইটুকু বড় আপ্‌শোষ।

কিন্তু তথাপি প্রণয়ের স্বাদ
পাইলাম কিছু ; আসিল প্রসাদ,
ঘুচিল অনেক মনের বিষাদ
এমন সময়ে কি 'বপদ !

যেতে হ'ল মোরে কর্ম্মের ফেরে !
বিদেশে, তথাপি কেমনে বা এরে
ফেলে যাব, সেই চিন্তায় ঘেরে
জড়ায়ে ধরিল দুটী পদ।

চলিনু তথাপি মনে করি জোর,
কিন্তু একি এ ! দুদিনেই মোর
কোথা গেল সেই স্বপ্নের ঘোর !
তবে কি প্রণয় হয় নাই ?

হবে যদি তবে আহারে অরুচি
কেন নাহি হ'ল, কেন এত লুচি
খাই প্রতিদিন, কি হেতু না ঘুচি
গেল নিদ্রাটি বল তাই ?

কোকিলের রব কেন নাহি কাণে
বজ্রের মত কঠোরতা হানে ?
চাঁদের কিরণে শীতলতা দানে
এখনো, একি এ বিপরীত ;

কেন বা বহিলে মলয়-বাতাস
মুখে নাহি আসে বল হা-হুতাশ
কেন বা না পড়ে দীরঘ নিশাস
রৌদ্রে কেন না ধরে শীত ?

ভেবেছিনু হায় করেছি দখল
যা কিছু, তা গেল নিমেষে সকল,
আসল খুঁজিতে কেবলি নকল
কপালেতে মোর হ'ল সার।

আসল প্রণয় নাই কিরে তবে
আজকাল আর এই পোড়া ভবে ?
অথবা ইহাই সম্ভব হবে
তেমন প্রেমিকা নাই আর।

কোথা শকুন্তলা কোথা মৃণালিনী
কোথা জুলিয়েট্ প্রণয়-শালিনী
অন্তত কোথা সে হীরা মালিনী
কে করে তাদের আনয়ন ?

কোথা রত্নাবলী, থিস্‌বী ললনা
হিরো, এণ্ড্রমিডা কোথায় বলনা
দেখা দাও মোরে না করি ছলনা—
দেখেও জুড়াই দু'নয়ন।

মহাশ্বেতা হায় কোথায় বা তুমি,
চেয়ে দেখ দেশ এবে মরুভূমি
একদিন যার পদতল চুমি
বহিত প্রণয় শতধার—

সে মিরন্দা কোথা সরলা যুবতী
কোথা সে বাসবদত্তা সুব্রতী
তিলোত্তমা চারু দময়ন্তী সতী
তারাই বা এবে কোথা আর ?

তাম্রকূট ও নস্য।

তাম্রকূট ও নস্য।*

—:০:—

মহর্ষি স্যর্ ওয়াল্‌টার র‍্যালের প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করুন। তাঁহার কৃপায় আজ পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক শান্তিলাভ করিতেছে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারও তাম্রকূট আবিষ্কারের নিকট অকিঞ্চিৎকর; তবে আমেরিকা আবিষ্কৃত না হইলে তাম্রকূট আবিষ্কৃত হইত কিনা ইহাই যা একটু সন্দেহ। তাম্রকূটকে এতটা উচ্চে স্থাপিত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে কারণ এই যে, যদিও আমেরিকার দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র পুরাতন গোলার্দ্ধের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে, তথাপি ঐ উন্নতির অভাবেও আমাদিগের ততটা ক্ষতি হইত না, যতটা হইত তাম্রকূটের অভাবে। আমেরিকা দ্বারা আমাদিগের যে সকল অভাব মোচিত ও দুঃখ দূরীকৃত হইয়াছে, সে সকল দুঃখ ও অভাবকে আমরা বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি এবং তদ্বারা আমরা যে সকল সুখ-স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইয়াছি তাহাও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাম্রকূট- সেবন-জনিত বিমলানন্দের কণিকামাত্র হারাইতে প্রস্তুত

* শব্দ দুইটি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা আমি অনেক চিন্তার পর আবিষ্কার করিয়াছি। তামাক "তাম্র"(কটা) বর্ণের ও তাহাকে "কুটিয়াই প্রায় ব্যবহার করিতে হয়; আর "নাসিকার শস্ত" কথাটিই নিশ্চয় সংক্ষিপ্ত হইয়া "নস্তে" পরিণত হইয়াছে।

নহি। তাম্রকূটের নির্ব্বাসন অসহনীয়, তাহার ক্ষতিপূরণ অসম্ভব। তাম্রকূটের সম্মোহন প্রেমালিঙ্গনে আমরা নিতান্তই বিভোর। তাহাকে পাইয়া আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি যে অন্যান্য সকল পার্থিব সুখই তাহার নিকট অপকৃষ্ট। মানবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ নিবারণ করিতে, সাংসারিক অশান্তিকে প্রশমিত করিতে এবং উচ্ছৃঙ্খল চিত্তের একাগ্রতা বিধান করিতে, তাহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। তাহার প্রভাবে অতি সামান্য ব্যক্তিও অচিরাৎ সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় সকল দুঃখদৈন্য ও শোকসন্তাপকে গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তাই বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের পরমোদার ধর্ম্ম যত শীঘ্র না ভূমণ্ডলের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শীঘ্রতর এই র‍্যালে-প্রচারিত তাম্রকূট সমগ্র মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল। কোন জাতি বা কোন দেশবাসীই ইহার প্রতি অনাদর বা অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। এই পিঙ্গলমূর্ত্তি দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে উপাসনা করা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ইহার উপাসকবর্গ নাই এরূপ স্থান সংসারে অতি বিরল। কি তুষারাচ্ছন্ন মেরুতে, কি রবিকরদগ্ধ বিষুবমণ্ডলে, কি জনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, কি শ্যামল পল্লীপ্রান্তে, কি সৌধশিরে, কি পর্ণকুটীরে, কি বাষ্পীয় শকটে, কি অর্ণবপোতে, সর্ব্বত্রই আমরা তাম্রকূটের বিশ্বব্যাপী মহিমার পরিচয় পাই।

বিশেষতঃ এই সনাতন ভারতবর্ষে তাম্রকূট সনাতন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পারস্যে, জাপানে, রোমে, এমন কি ইংলণ্ডে

পর্য্যন্ত কখন কখন তাম্রকূটের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে ভারতবর্ষীয়েরা একবার যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে চিরদিনই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস-ঘাতকতাকেও বিশ্বাস করিতে চাহে না, স্তূপীকৃত যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধেও সে বিশ্বাস অটল থাকে। তাছাড়া—তাম্রকূট তাঁহাদের আশ্রিত এবং তাঁহারাও এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাম্রকূটের শরণাপন্ন, সুতরাং তাম্রকূটের পরিবর্জ্জন তাঁহাদিগের মতে অশাস্ত্রীয় ও নীতি-বিরুদ্ধ। তিনি শত অপরাধ করিলেও তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি এক্ষণে সার্ব্বজনীন ভক্তির অধিকারী; রাজাধিরাজ হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা উপকৃত এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। যদি আপনি একজন দরিদ্র কৃষকের গৃহেও আতিথ্য গ্রহণ করেন, বা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন, তাহা হইলেও আপনি তাম্রকূট সেবায় বঞ্চিত হইবেন না। উহা এখন সাধারণ ভদ্রতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহে যদি তাম্রকূটের বন্দোবস্ত না—ই থাকে, তাহা হইলেও দুই একবার "তামাক দে" শব্দ উচ্চারণ করিলে কথঞ্চিৎ ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে, নতুবা আপনি 'অসভ্য বর্ব্বর' বলিয়া পরিগণিত হইবেন। পাছে কেহ এই সমাজ-নিন্দিত আখ্যাটির গুরুভারকেও অর্থপ্রিয়তার তুলনায় লঘু বলিয়া বিবেচনা করেন, তাই অনুরূপ-মাহাত্ম্যে তাম্রকূট সেবন করান কার্য্যটি অশ্বমেধ-ফল-প্রসবি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এবংবিধ বহুগুণান্বিত তাম্রকূটের আবিষ্কর্ত্তা পূজ্যপাদ স্যর্ ওয়ালটারের নাম কি হেতু খৃষ্টীয় ক্যালেণ্ডারে ও অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকায় স্থান পায় নাই তাহাই চিন্তার বিষয়। সিসীলিয়া অর্গানযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া যদি সেণ্ট-উপাধি লাভ করিতে পারেন, তবে মহাত্মা র‍্যালে কি সে উপাধি লাভের যোগ্য ন'ন? তিনি যথার্থই ঋষিপদবাচ্য। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে বৎসরে দুই দিন করিয়া সর্ব্বত্রই অবকাশ দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে ঐ অবকাশে আমরাও অধিক মাত্রায় ধূম পান করিয়া তাঁহার পিণ্ড ধূমাকারে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিব। জীবিতাবস্থায় তাম্রকূটের ন্যায় প্রিয় বস্তু তাঁহার আর কিছুই ছিল না; সুতরাং তাম্রকূটের ধূমই তাঁহার উপযুক্ত পিণ্ড এবং তিনি জনসাধারণেরই পিণ্ডাধিকারী। আমি কল্পনা-চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে তিনি বায়ুলোকের এক সমুচ্চ স্তরে অধিরূঢ় হইয়া তাঁহার অশরীরি পাইপ্‌টি মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অশরীরি ধূমপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছেন।

তাম্রকূট কি যে-সে পদার্থ? বৈদিকযুগে ঋষিরা সোমরস পান করিতেন। যদি কেহ তখন তাঁহাদিগকে দ্রাক্ষার বা তাম্রকূটের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার নাম মধুচ্ছন্দে বা গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত হইয়া চিরদিনের মত অমর হইয়া থাকিত।

তাম্রকূট এক প্রকার দেবতা; সুতরাং তাঁহার পূজা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বৃক্ষপত্র বলিয়া তাঁহার দেবত্বে সন্দিহান

হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়। আমরা যখন তুলসীকে দেবী বলিয়া পূজা করি, তখন তাম্রকূটকে দেবতা বলিতে আমরা বাধ্য। তাম্রকূটে ত দেবতার সমস্ত গুণই বর্ত্তমান। তাঁহার শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অথচ সে অসীম শক্তি আমরা কে অস্বীকার করি? যখন দেহ মন অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন তাঁহারই কৃপায় আমরা নবশক্তি লাভ করিয়া থাকি। তিনি দেবতা বলিয়াই তাঁহার উপাসনায় আমরা এতটা তন্ময় এতটা বিভোর হইয়া যাই; এবং উপাসনান্তে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও পবিত্রতা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তিনি দেবতা হইলেও অপ-দেবতা নহেন। তিমি ঘাড়ে চাপিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিলোপ করেন না অথবা মনুষ্যকে অপ্রকৃতিস্থ বা সংজ্ঞাহীন করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি বাগ্দেবীর ন্যায় কণ্ঠে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞান, ধীশক্তি, দূরদর্শিতা, উদারতা, রসপ্রিয়তা ও সাহিত্যসেবিত্ব আনিয়া দেন।

যেরূপ আদ্যাশক্তি ভগবতীই আপনাকে দশমহাবিদ্যারূপে বিভক্ত করিয়া দশটি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তাম্রকূটও অনেক রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। সাধকবর্গের রুচি ও প্রকৃতি-ভেদেই উহার একমাত্র কারণ। তাম্রকূটের যতগুলি রূপান্তর আছে তন্মধ্যে নস্য একটি অন্যতম।

ডিকুইন্সি অহিফেনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেক্সপিয়র ও কীট্‌স্ বোতলবাহিনীর প্রশংসা করিয়াছেন, বঙ্কিমবাবু তাঁহার বিষ-বৃক্ষে ও কমলাকান্তে উভয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু তাম্রকূট-

মহিমা বড় কেহই কীর্ত্তন করেন নাই। বঙ্কিমবাবু একস্থলে ধূমীয় তাম্রকূটের কথঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু চূর্ণিত তাম্রকূটের প্রতি কোন ভক্ত কবি বা লেখকের দৃষ্টি এ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আমি একজন নগণ্য উপাসক হইলেও নস্য সম্বন্ধে দুই একটি স্তুতি-বাদ করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

হে নস্য! তুমি শিশি-কৌটা-বিহারী। পকেট ও বসন-গ্রন্থির নিকটস্থ ট্যাঁক নামক স্থানই তোমার মন্দির, এবং কৌটা ও শিশিই তোমার সিংহাসন।

পূর্ব্বে তুমি ন্যাকড়ার ছিপিযুক্ত শামুকের খোলায় বিরাজমান থাকিতে। শুনিতে পাই যাহারা তোমাকে ঐরূপভাবে রক্ষা করিত, তাহাদিগের অনেকেরই অনুনাসিকত্ব সম্পাদন করিয়া তুমি আপন অযত্নের প্রতিশোধ লইতে।

তোমার প্রখর অভিশাপে তাহারা 'কবর্গ' ও 'পবর্গে'র পঞ্চম বর্ণে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া কত লাঞ্ছনা ও অসুবিধাই না ভোগ করিত। 'ম'কার স্থলে 'ব'কার উচ্চারণ করিবার বাধ্যতা বশতঃ জনৈক অধ্যাপক নাকি তাঁহার মাতুলকে একদা ভদ্রজন-বিগর্হিতভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও তোমার বিগ্রহ কেবল মছলিপত্তম্ ও কাশীধামেই নির্ম্মিত হইত। এক্ষণে মান্দ্রাজ প্রদেশে ও বঙ্গদেশের নানা স্থানেই তোমার বিগ্রহ নির্ম্মিত হইতেছে। ইউরোপীয় কারি-করেরাও তোমার উৎকৃষ্ট বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, কিন্তু অস্মদ্দে-শীয় বিগ্রহে তুমি যেরূপ জাগ্রতভাবে অধিষ্ঠান কর, এরূপ আর

কোন দেশের বিগ্রহেই নয়। তোমার বিগ্রহ যেরূপ স্থূলভাবে নির্ম্মিত হইত এক্ষণ তদপেক্ষা অনেক সূক্ষ্মতরভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তুমি যে কেবল সূক্ষ্মতা লাভ করিতেছ তাহা নহে, অঙ্গে সুগন্ধ মাখিয়া বিলাস-প্রিয়েরও মনোরঞ্জন করিতেছ, কারণ শাস্ত্রেই লিখিত আছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

তোমার প্রভাবে এক সময় "ঘট-পটত্ব" "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" প্রভৃতি নানাবিধ কূটতর্ক ও শাস্ত্রের জটিল ব্যাখ্যা পার্ব্বত্য প্রস্রবণের ন্যায় পুরাতন টিকিশালী মস্তিষ্ক-গহ্বর হইতে স্বতই প্রবাহিত হইত।

ইংলণ্ডের সাহিত্যরথী জন্সন্ যে একদা কোন ভদ্রমহিলার নিকট হইতে অসামান্য ভাষায় সামান্য একটু নস্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা জন্সনীয় ভাষার উদাহরণস্বরূপ অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাৎকালিক সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেই নস্যের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং আমাদিগের কুললক্ষ্মীরা আজকাল যেরূপ দোক্তা ও গুলের কৌটাকে অঞ্চলনিধি করিয়াছেন, তাঁহারাও সেইরূপ নস্যদানীকে নিত্য সহচরী করিয়াছিলেন।

মার্কিন দেশের লোকেরা নস্যের এতই সমাদর করিতেন যে তত্রস্থ ধনী ব্যক্তিরা অনেক সময় হীরক-মুক্তা-খচিত নস্যের কৌটা পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন। এমন কি জাতীয় মহা-সভায় সভাপতির বেদীর পার্শ্বে একটী নস্যপূর্ণ কৌটা সংরক্ষিত হইত। সভাপতি বক্তৃতা কালে মধ্যে মধ্যে সেই উপাদেয় চূর্ণ নাসিকা-

বিবরে গ্রহণ করিতেন এবং সমাগত সভ্যমণ্ডলীও বোধহয় সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নস্য ব্যতীত তাঁহারা বিতর্ক ও গবেষণায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না।

হে নস্য, তোমাকে ভজনা না করিলে এখনো অনেকের বুদ্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না। যদি তুমি কেবল মাত্র তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে অবস্থান কর, তাহা হইলেও অবিবেচনার বা কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই। তুমি তাম্রকূটের সকল প্রকার মূর্ত্তিভেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই বোধ হয় তোমাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান মস্তকে প্রবেশ করান হয়। যিনি তাম্রকূটকে নস্যরূপে মস্তকে, ধূমরূপে বক্ষঃস্থলে ও দোক্তা বা জরদারূপে উদরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তাম্রকূটের 'ত্রিচক্র' ভেদ করিয়াছেন এবং তিনি যে মহাপুরুষ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কেহ বলেন, নস্যসাধনার অনেকগুলি উপদ্রব আছে, যথা—হাঁচি, আঘ্রাণশক্তির হ্রাস ও নাসিকা-বিবরের আয়তন-প্রসার। এই উপসর্গ গুলি অনধিকারীতে ও অতিরিক্তসেবীতেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাতে নস্যের অপরাধ কি? অনধিকারীর অযথা সেবাতে দেবতারা ত রুষ্ট হইতেই পারেন।

হে নস্য, চূর্ণ তোমার একটি অপরিহার্য্য উপাদান। যেরূপ গোলমরিচ ব্যতীত সিদ্ধির, চপ্‌-কাট্‌লেট ব্যতীত মদ্যের, পিয়ানো ব্যতীত ড্রয়িং রুমের, কোলাহল ব্যতীত বিদ্যালয়ের, হাস্য-পরিহাস ব্যতীত বাসর-গৃহের ও পরদশোভিনী-গৃহিণী ব্যতীত গৃহের গৌরব

বিকসিত হয় না, সেইরূপ চূর্ণ ব্যতীত তোমার মাধুর্য্য বিকসিত হয় না।

তুমি নিদ্রিতকে জাগ্রত করিবার ও জাগ্রতকে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিবার একটি অমোঘ মহৌষধ। তন্দ্রার সুমধুর আকর্ষণে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অবশ হইয়া আসে, তখন তাহাদিগকে সহসা সতেজ করিয়া তুলিতে তুমি ব্লিষ্টার অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকরী। রামায়ণে লিখিত আছে যে লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বিনিদ্র ছিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে তিনি অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিবার সময় একপাত্র আসল হিঙ্গলীর নস্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। হে নস্য! তুমি যদি নিদ্রাকে অবলীলাক্রমে পরাভূত করিতে পার, তবে মানবের চিরনিদ্রা নিবারণ করিবার কি তোমার কোনই শক্তি নাই?

যশোহর।
১১ই মাঘ, ১৩১৮

শালী-মাহাত্ম্য।

——:*:——

(১)

শালী কি মধুর নাম,

শুনিলেই প্রাণ করে আন্‌চান্‌,

কপালেতে ছুটে ঘাম।

ছুটি অক্ষরে আ মরি কি ভাব!

পুলকে ও ভয়ে মাথামাখি ভাব,

শালী-সম্পদ্‌ যাহার অভাব,

ব্যর্থ বিবাহ তার।

তীব্র-মধুর এ নামটি হায়

না জানি রচনা কা'র।

(২)

শালী কি মধুর নাম,

চিনি চেয়ে তা'র অধিক সুতার,

গিনি চেয়ে বেশী দাম।

নামে পরাজিত চিনি আর গিনি

হয় যদি, তবে ভেবে দেখ তিনি

নিজে কি জিনিষ; গৃহিণীরে জিনি

তাঁহারি অধিক মান,

যথা, মহাজন কাছে আসলের চেয়ে

সুদেরি অধিক টান।

(৩)

শালী কি মধুর নাম,
সেই সুখশালী, যে পেয়েছে শালী,—
মর্ত্ত্যে গোলোক-ধাম।
আদরে যতনে ক্রীড়া-পরিহাসে,
শাসনে পীড়নে ব্যঙ্গ-বিলাসে,
কৌতুক-ভরা বিদ্রূপ-হাসে
শালীসম কেহ নাই,
জনমে জনমে শৈশব হ'তে
শালী যেন খালি পাই।

(৪)

শালী কি মধুর নাম,
দেহ-নৌকার শালী কর্ণ-ধার
জীবন-সেতুর থাম।
ভগিনী-পতির যুগল কর্ণ
ঝাঁকি দিয়া তিনি করেন স্বর্ণ,
তাঁহার পরশ-পরশে বর্ণ
হয় রাঙ্গা অনুরাগে,
কেন যেন তবু না ঝরে নয়ন
ব্যথা যদি বড় লাগে।

(৫)

শালী কি মধুর নাম,
শালীহীন জন অতি অভাজন,
বিধিও তাহারে বাম।
শালীর চাহনি শালীর হাসিতে
সুখনীরে প্রাণ থাকে গো ভাসিতে,
শালীর সোহাগ বেদনা নাশিতে
যেন গো সুদিং-বাম ;
ভক্তিভরেতে এ হেন শালীর
খুরেতে শত প্রণাম।

কুচবিহার।
১৫ই ভাদ্র, ১৩১৯।

নিবেদন।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা কলেজ ও স্কুলের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও বিক্রয় করিয়া সুধীসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছি। আমাদের ব্যবহারে কেহই অসন্তুষ্ট হন নাই ইহা আমাদের গৌরবের কথা। যাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি তাঁহাদিগকে আমাদের শত শত ধন্যবাদ। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পুরাতন পৃষ্ঠপোষক গ্রাহকগণের অনুরোধে ও সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা অনেক রকম ইংরাজি ও বাংলা, নাটক, নভেল, কাব্য, কবিতা ও ধর্ম্মগ্রন্থ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের এখানে ছেলে ও মেয়েদের প্রিয়জনকে উপহার দিবার সকল রকম পুস্তকও পাইবেন।

সাধারণতঃ আমরা সকল রকম বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকি। আবশ্যক হইলে আমরা নাগরী, উড়িয়া, পার্শি পুস্তকও প্রকাশ করিতে পারি।

প্রফেসর মণিমোহন সেন, এম, এ, বি, এল, ও প্রফেসর পঞ্চানন সিংহ, এম্, এ, বি, এল, মহাশয়দ্বয় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার

শ্রীসরোজকুমার সেন, বি, এ, কণ্ট্রোলার

শ্রীমোহিতকুমার সেন, বি, এ,—প্রকাশক

সেন, রায় এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক,

কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্,

কলিকাতা।